উপন্যাস

দিন যায় রাত যায় আশায় আশায়

জসিম মল্লিক

১.

বছরদেড়েক আগের কথা। হিলসাইডের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ইকবালের মনে পড়ে গেলো সেই দিনটির কথা। কী পাগলামীটাই না করেছিল কনা। জ্যামাইকা এলাকায় এখন অনেক বাঙ্গালিদের দোকানপাট। 'ডিসকাউন্ট' নামের সেই দোকানটা এখনও আছে বটে তবে মালিকানা বদলে গেছে। কনাও আর নেই। কোথায় গেছে তাও জানে না ইকবাল। কনা ইসলাম প্রায়ই বলত ও যেদিন থাকবে না সেদিন এই দোকানও থাকবে না। দোকানের ওনার নাকি ওর উপর এতটাই ডিপেনডেন্ট ছিল যে ওকে ছাড়া দোকান চলবে না। আসলে এই দোকানটার মালিক কনাই ছিল। ইকবাল জেনেছে। কনা ছিল খুব অহংকারী মেয়ে। এমনি দেখতে হাসি খুশী কিন্তু ভিতরে ভিতরে ছিল প্রচন্ড অহংকার। কনার অহংকারের কারণ হচ্ছে সে নিজে একজন লেখক এবং তার এক ভাই মন্ত্রী।

ইকবাল তিন দিন হয় এসেছে দেশ থেকে। একটু বিশ্রাম করে নিয়েছে। তিন চার দিনের আগে ওর জেটল্যাগ যায়না। পড়ে পড়ে শুধু ঘুমায়। লং আইল্যান্ডে দুই রুমের এপার্টমেন্টে থাকে। সুন্দর করে গোছানো। নিউইয়র্কে বিশীরভাগ বাঙ্গলিরা যেভাবে কোনোরকম মাথা গুজে থাকে ইকবাল ওরকম না। ওরা শুধু পয়সা চেনে। খরচ করার সাহস নাই। অনেকে আছে পনেরো বছর ধরে এই শহরে আছে কিন্তু কোনোদিন নিউইয়র্কের বাইরে কোথাও যায়নি। চেনেও না কিছু। লুঙ্গি পড়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পাছা চুলকায় আর পানের পিক ফেলে। একটা রুমে পাঁচজন/দশজন মিলে থাকে। ঘরে ঢোকা যায়না গন্ধে। কার বউ কার সঙ্গে থাকে তার কোনো হদিস থাকেনা প্রায়শই। ইকবাল এইসব লোকদের কাছ থেকে দূরে থাকে। কমিউনিটির লীডারদের কাছ মারায় না সহজে। ওদের কাজ হচ্ছে আওয়ামী লীগ বিএনপি করা আর পত্রিকায় ছবি ছাপার জন্য ব্যস্ত থাকা। দেশে থেকে পাচার করা টাকা দিয়ে ফুটানি মারা। অনেকেতো বাঙ্গালি হয়ে বাঙ্গালিদের পথে বসিয়ে দিতে ব্যস্ত। রিয়েল এস্টেটের ব্যবসার নাম করে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়া। পুলিশ সারাক্ষনই এদের পিছনে নজরদারী করে।

ইকবালকে কেউ বেশী ঘাটাতে সাহস পায়না। ও যেমন সাহসী তেমনি স্ট্রেইটকাট কথা বলে। কাউকে তোয়াক্কা করে না। তবে সবার সাথেই চমৎকার রিলেশন মেইটেইন করে চলে। প্রচুর বন্ধু ওর নউইয়র্কে। সেটাই স্বাভাবিক। ইকবালের মতো সুদর্শন, মিষ্টভাষী আর পয়সাওয়ালার বন্ধুর অভাব হওয়ার কথা না। দু'হাতে ইকবাল পয়সা ওরায়। কানাডাতেও ওর অনেক বন্ধু আছে। প্রায়ই ঢুঁমারে। ঘোরা হচ্ছে ইকবালের প্রধান নেশা।

বাবু নামে একটি ছেলে ওর সাথে থাকে। বাবু ঠিক ওর বন্ধু না হলেও ওকে যথেষ্ট পছন্দ করে ইকবাল। ইকবালের নিউইয়র্কে মোবাইল ফোনের দোকান আছে। টি মোবাইল। এস্টোরিয়াতে। মাসে ওর কম করে হলেও দশ বারো হাজার ডলার ইনকাম। ও যখন থাকে না তখন বাবুই সব

দেখাশুনা করে। খুউব বিশ্বাসী। বাবুর উপর নির্ভর করা যায়। চুরি চামারির অভ্যাস নাই। তিন বছর ধরে বাবু আছে। কাগজ হয়নি। বাবুর চমৎকার রান্নার হাত।
ইকবাল একা একাই হাঁটছিল জ্যামাইকার এ দিকটা দিয়ে। ওর এক বন্ধু আছে এখানে। একটা লিকারের দোকানে কাজ করে। অনেক বছর ধরে একই দোকানে কাজ করছে। পাকিস্তানী মালিক। বন্ধুটিকে খুব পছন্দ করে। ওর ওখানেই এসেছিল। একটা বাকারডি রাম কিনেছে। রাসবেরী ফ্লেভার। ইকবালের প্রিয় ডিংকস। ডিসকাউন্ট নামের দোকানটা দেখে ঢুকে পড়লো। বেশ বড় দোকান। সবকিছুই আছে দেখলো। ব্রা থেকে শুরু করে কনডম পর্যন্ত। এক সাইডে চা কফির ব্যবস্থাও রেখেছে।
তখন সন্ধ্যা। ভিতরে ঢুকে দেখলো কাস্টমার কেউ নেই। একটি ফর্সা মতো মেয়ে ক্যাশকাউন্টারে বসে বাংলা পত্রিকা পড়ছে। মেয়েটি প্রথমে বেশ একটু তাচ্ছিল্যের সাথে ইকবালের দিকে তাকালো। যা হয় আর কি। প্রবাসী বাঙ্গালিদের একটা হামবরা ভাবতো থাকেই। কোনো কারণ ছাড়াই থাকে। ইকবাল এসব গায়ে মাখে না। ইকবালকে উড়িয়ে দেয়া এতো সহজ হবে না ও জানে।
মেয়েটির মুখটা গোলগাল। চশমা পড়া। চশমার আড়ালে ভাসা ভাসা দুটো চোখ। একেই হয়ত বলে কাজল কালো চোখ। গোফে হালকা পশমের রেখা। মনে হয় শেভ করে। সুগঠিত বক্ষ। তেমন কোনো খুত নেই। মশ্রিন গলার ভাজ। চোখে চোখ পড়তেই ইকবাল মিস্টি করে হেসে বলল, আপনার দোকানটা বেশ সুন্দর করে সাজানো। পত্রিকা পড়া দেখেই বুঝেছি আপনি বাঙ্গালি এবং শুধু তাই নয় আপনি ভালো লেখেনও। ছবি দেখেছি।
ইকবাল একনাগারে কথাগুলো বলে গেলো। যা যা বললে একটি মেয়ে খুশী হতে পারে তাই বললো ইকবাল। মেয়েদের খুশী করা পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজের একটি জেনেও ইকবাল সেই চেষ্টাই করলো। মেয়েদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে সে নিজেই ভালো জানে না সে কি চায়। তার চাওয়াটা কেমন। কিভাবে সুখী হতে হয় তাও ভালো জানা নেই। কিভাবে সুখী রাখতে হয় সম্ভবত তাও না। এসবই অবশ্য ইকবাল নিজস্ব বিশেষন। ইকবাল লক্ষ করলো মেয়েটির মুখ থেকে তাচ্ছিল্যের ভাবটুকু সরে গিয়ে একটা খুশীর ভাব ফুটে উঠছে। চিকন ঠোঁটের নিচে আলতো হাসি ঝুলে আছে। ইকবাল বুঝতে পারছে ওর দেয়া পথ্য কাজে লাগছে। ওর থলেতে আরো পথ্য আছে। দরকার হলে কাজে লাগাবে। অহংকারী মেয়েদের কিভাবে পথে আনতে হয় ইকবাল সেটা ভালো জানেনা বটে তবে চেষ্টা করতে দোষ নেই কিছু। ইকবাল নিজে স্বভাবে অহংকারী নয় তবে স্পর্শকাতর।
মেয়েটি তার গজ দাত বের করে হেসে বললো, আপনি আমার লেখা পড়েন!
আমি ভীষন ভক্ত। একটু ঘুরিয়ে বলল ইকবাল।
আমার না লেখার!
আগে লেখার ছিলাম এখন দুটোরই।
ওহ্ থ্যাংকস। হাসলো মেয়েটি। হাসিটা বেশ ভালো। কেমন যেনো বুকের মধ্যে গেঁথে থাকে। মেয়েরা কেনো যে এই হাসি হারিয়ে ফেলে! ইকবাল বুঝে পায় না।
আপনার গল্পগুলো খুব রোমান্টিক। বিশেষ করে 'বলাকা' গল্পটি আমার খুব ভালো লেগেছে।

মাইগড! আপিনি ওটা পড়েছেন! আমারতো ধারনা ছিল ছেলেরা এসব পড়েনা। তাদের এতো সময় আছে নাকি!
সবার লেখা পড়ি না। আপনার লেখা পড়ি।
কাকতলীয়ভাবে ইকবাল লেখাটা সত্যি পড়েছিল। এখন কাজে লাগছে। পৃথিবীতে কোনো কিছুই ফেলনা না।
এইফাকে মেয়েটি ইকবাল জন্য কফি বানিয়ে ফেলেছে। বেশ প্রফুল। বলল, আপনার মোবাইল ফোনের দোকান আছে তাইনা! আপনাকে দেখেছি এস্টোরিয়াতে।
এই টুকটাক করে খাচ্ছি।
বেশ ভালো ব্যবসা তো।
আচ্ছা লেখকরা কী তাদের লেখার মতোই রোমান্টিক! প্রসঙ্গ থেকে সরে যেতে চায়না ইকবাল।
কনা একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, কি জানি।
আপনি!
আমি কী!
লেখার মতো রোমান্টিক!
মেয়েটি দাতে দাত কামড়ে কয়েক সেকেন্ড কি ভাবলো। ভঙ্গিটা সুন্দর। লেখককে পছন্দ হয়ে গেলো ইকবাল। প্রথমের তাচ্ছিল্যের ভাবটুকু ইগনোর করলে আর সবই ভালো। ইকবাল ভাবলো বন্ধুত্বের জন্য বৈবাহিক স্ট্যাটাস ও বয়স কোনো বাধা হতে পারে না। ধর্মও নয়। এটা ইকবাল সারাজীবনের আদর্শ।
আচ্ছা আপনি কি একটু এদিকে আসবেন!
কোথায়!
বেসমেন্টে।
কোনো!
আপনাকে একটা জিনিস দেখাবো।
ইকবাল কোনো দ্বিধা না করেই বেসমেন্টে গেলো। রাজ্যের জিনিস বেসমেন্টে। সিঁড়ির শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে দুজন। খুব কাছাকাছি। কনার নিঃশ্বাস ইকবাল মুখে। কনা এরপর যা করলো তা সিনেমাকেও হার মানায়। ইকবালকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো। একবারই মাত্র। তবে সেই চুম্বনে ছিল গভীর আশ্লেষ। বজলু হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকলো। তারপর উপরে উঠে এলো।
বজলু আসার সময় বলেছিল কনা তুমি আসলেই রোমান্টিক!
এভাবেই শুরু হয়েছিল ওদের সম্পর্ক।
পরবর্তীতে ইকবাল টের পেয়েছিল কনা মেয়েটি কতখানি ডেঞ্জারাস রোমান্টিক। সুযোগ পেলেই ছুটে আসতো ইকবালের লংআইল্যান্ডের বাসায়। না হয় ওকেই ডাকতো। কনা নিজের মতো করে পেতে চাইতো সবকিছু। অন্যের অসুবিধার কথা ভাবত চাইতোনা মোটেই। ইকবাল বুঝতে পারছিল কনা কোনো কিছু নিজের মতো করে ঘটাতে না পারলে লেখার মধ্যে তার শোধ নিত। তীব্র জ্বালা ফুটিয়ে তুলত। দু'একবার ইকবালকে আক্রমন করেছে লেখার মাধ্যমে। যখনই বুঝতে পেরেছে

ইকবাল আর ওর গ্রিফে নেই সেদিন থেকেই ইকবাল হয়ে উঠেছে ওর প্রধান শত্রু। মেয়েদের প্রতিহিংসা খুবই ভয়াবহ। অন্যকে ধ্বংস করে না দেয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হয় না। ইকবাল অনেক কৌশলে কনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। কনা শেষ পর্যন্ত ইকবালকে পুরোপুরী ত্যাগ করেছিল। কনা ছিল স্যাডিস্ট। এটাই সম্পর্ক ভেঙ্গে যাওয়ার কারন হতে পারে।

২.

ইকবাল টরন্টো এসেছে গত পরশু।

ইকবাল একনাগারে দু' মাসও এক জায়গায় থাকতে পারেনা। হাফিয়ে উঠে। কিছুতেই বেশীদিন কারো প্রতি মনোনিবেশ রাখতে পারে না। খুব আগ্রহ নিয়ে শুরু করলেও দ্রুত আগ্রহ হারানোর একটা বাতিক আছে। ইকবালের ভিতরের এই চাঞ্চল্য অন্যে কেউ টের পায় না। মানুষের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে যা অন্যেরা জানে না। একজন কাউকে বাইরে থেকে আপাতঃ সুখী মনে হলেও সে তা নাও হতে পারে। ইকবাল হোসেনকে বোঝা যে কারো জন্য সত্যি কঠিন। অনেক তো দেখলো কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানুষ একাই। পৃথিবীতে কেউ কারো নয় ভাবলো ইকবাল।

ইকবাল ওর বন্ধু কামালের সাথে টরন্টোর মেট্রো কনভেনশন সেন্টার নামক এক জায়গায় এসেছে তালাত আজিজের কনসার্ট শুনতে। হঠাৎ মুখোমুখী দেখা হয়ে গেলো সীমার সাথে! সাথে সুদর্শন এক ভদ্রলোক। সুন্দরী সীমা ব্যানার্জী। দু'বছর পর দেখা!

সেই দিনটির কথা খুব মনে পড়ে। যেদিন সীমার সাথে পরিচয় হলো। আটলান্টিক সিটিতে হোটেল শেরাটনের বলরুমে একটা কনসার্ট ছিল সেদিন। ছোট্ট শহর আটলান্টিক সিটি। আটলান্টিক সাগরের তীর ঘেষে গড়ে উঠেছে এই অসাধারণ পর্যটন শহরটি। নিউজার্সি স্টেটের একটি শহর। প্রায় চার পাঁচ হাজার বাঙ্গালি বাস করে এই শহরে। আজকাল সর্বত্রই বাঙ্গালির দেখা মেলে। পৃথিবীর এমন কোনো প্রান্ত নেই যেখানে বাঙ্গালি নেই। ক্যাসিনোগুলোই প্রধাণত এখানকার মানুষদের কাজের উৎস। এখানে বাঙ্গালিরা বেশ ভালো আছে।

সীমা চমৎকার রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেছিল। বাংলাদেশ থেকেও কয়েকজন শিল্পী এসেছিল কনসার্টে। কিন্তু সীমার সঙ্গীত মুগ্ধ করেছিল শ্রোতাদের। সীমা কলকাতার বালিগঞ্জ এলাকার মেয়ে। কলকাতার মেয়ে হলেও সীমা প্রায়ই বাংলাদেশে আসে। ওর বাবার বাংলাদেশে ব্যবসা আছে। ওখানে সীমা একটা প্রাইভেট ফার্মে কিছুদিন কাজও করেছে। কলকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে ব্যাচেলার করেছে।

অনুষ্ঠান শেষে লাউঞ্জে দেখা হলো সীমার সাথে। ইকবাল ওর এক বন্ধুকে নিয়ে ড্রাইভ করে এসেছিল আটলান্টিক সিটিতে। অনুষ্ঠান দেখার চেয়েও ক্যাসিনোতে খেলাই ওর উদ্দেশ্য। প্রায়ই আসে ইকবাল। বোরগাটা এবং ওয়াটার ক্লাব নামক সুদৃশ্য ক্যাসিনোতে খেলতে যায়। আজকাল তাজমহলের কদর কমে গেছে। তাছাড়া এখন আমেরিকার অর্থনীতি কিছুটা মন্দা। ক্যাসিনোগুলোতে তেমন ভীড় হয়না। বিশ্বব্যাপী যে অর্থনৈতিক মন্দা তার প্রভাব আমেরিকার অর্থনীতিতে আঘাত করবে সেটাই স্বাভাবিক।

অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে এগারোটার দিকে। আজকের রাতটা ক্যাসিনোতে কাটানোর ইচ্ছে। এ এক নিষিদ্ধ আকর্ষন। স্লট মেশিনের ঝন ঝন শব্দে কয়েন চলে আসার অনিশ্চিত সম্ভবনার নেশায় বুদ হয়ে থাকে কত মানুষ। অবশেষে নিঃশ্বেস হয়ে বাড়ি ফেরে। জানা যায় ক্যাসিনোতে মাত্র ৬% টাকা দেয়া হয়। বাকীটা খেয়ে ফেলে রাক্ষুসে মেশিন। তারপরও মানুষ ছুটে আসে। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী ক্যাসিনোতে খেলে চাইনীজরা। ওদের চেয়ে বড় জুয়াড়ু আর নেই।

সীমা দেখতে শ্যামলার মধ্যে হলেও অসম্ভব মিষ্টি চেহারা। ওর স্বপ্নময় চোখজোড়া যে কাউকে আকৃষ্ট করবে। বয়স তেইশ চব্বিশ হবে। তুল তুলে চেহারার মেয়েটির চোখে মুখে অদ্ভুৎ এক মায়া আছে। হাসিতে রয়েছে রাজ্যের সারল্য। ঢাকার অদ্রিয়া'স ফ্যাশনের লেজার জর্জেটে এমব্রয়ডারি বক করা থ্রিপিস পড়েছে সীমা। প্রথম দৃষ্টিতেই নজর কাড়ে মেয়েটি। বাঙ্গালি পোষাকে আরো ভালো লাগছে। মুগ্ধ শ্রোতারা অনেকক্ষন ওকে নিয়ে ভীড় করে ছিল। যখন একটু একাকী হলো তখন ইকবাল এগিয়ে গেলো।

আপনি খুব চমৎকার গান করেন।

মেয়েটি ওর মায়বি চোখ তুলে তাকিয়ে বলল, থ্যাংঙ্কস।

আমি এত মিষ্টি কন্ঠ অনেকদিন শুনিনি। রবীন্দ্র সঙ্গীত অনেকেই করে কিন্তু আজকাল প্রায়ই দেখি সুর বিকৃত করে গান গায়। আপনার তা হয়নি। যদিও আমি গান এত ভাল বুঝি না। তবে স্বাভাবিক নিয়মে গান খুব ভালবাসি।

আমি আসলে এখনও শিখছি।

আপনার গলায় অসাধারণ সুর আছে।

চেষ্টা করি মন দিয়ে গাইতে।

আপনার গান আগেতো কখনও শুনিনি!

আমি এখানে স্টেজে গাইনি কখনও।

কেনো!

আমাকেতো কেউ চেনেই না!

নতুন এসেছেন!

তা বলতে পারেন।

কতদিন হয় এসেছেন!

বছর খানেক কবে।

শুনলাম নিউইয়র্ক থাকেন। কোন এলাকায়!

আমি থাকি ৩৮-৩১ স্ট্রিটে। লং আইল্যান্ড সিটি।

এখানে কার সাথে এসেছেন!

আয়োজকদের সাথেই। আমার এক রিলেটিভ আছে অবশ্য এখানে।

থাকবেন এখানে কয়েকদিন!

পরশু বা তার পরদিন চলে যাবো।

অনেক কিছু জানতে চাইলাম বলে কিছু মনে করবেন না। আপনার সাথে আলাপ করে ভালো লাগলো।
আমারও। আমি কিছু মনে করিনি।
থ্যাংকস।
আপনি কী এখানে থাকেন!
না। আমিও নিউইয়র্ক থাকি। লং আইল্যান্ড।
ও।
আপনি কী এখন আত্মীয়র বাসায় যাবেন!
হুঁ।
আপনি!
আমি একটা হোটেলে উঠেছি। ক্যাসিনোতেই রাত কাটে অবশ্য।
ওহ্। সীমা হাসলো।
আপনার সাথে আর কি দেখা হবে!
ঠিক জানি না।
আপনি চাইলে পৌঁছে দিতে পারি।
না না ঠিক আছে।
এখন থেকে চেষ্টা করবো আপনার সব গানের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে।
আমি একদম পরিচিত নই।
এবার চিনে গেছে সবাই। দেখবেন কত ব্যস্ত হয়ে যাবেন। নিউইয়র্কেতো হামেশাই অনুষ্ঠান লেগে থাকে। আমার একটা কার্ড রাখেন। ফোন করবেন।
ইকবালের মনের মধ্যে একধরনের প্রশান্তি নিয়ে ফিরে গেলো। কেনো ঠিক জানে না। চমৎকার বাক্য বিনিময় হয়েছে বলেই হয়তো। বিদেশে বাঙ্গালি মেয়েদের বোঝা খুব মুস্কিল। বন্ধুত্ব আরো কঠিন। সংসারই টিকে থাকেত চায় না! '..এই মনিহার হার আমায় নাহি সাজে... গুন গুন করে সীমার গাওয়া গানের কলি ভাজতে ভাজতে গাড়ি ছোটালো ক্যাসিনোর দিকে। আশ্চর্য সেদিন রাতে ইকবাল ক্যাসিনোতে অনেক টাকা উইন করেছিল।
৩.
পরদিন বিকেলেই সীমার ফোন।
কেমন আছেন!
ওহ্ আপনি! কী সৌভাগ্য আমার।
কেনো!
আপনি যে ফোন করবেন ভাবিনি। মনে হয়েছিল ওটাই প্রথম এবং শেষ দেখা। অনেকের সাথেইতো পরিচয় হয় কিন্তু কন্টিনিউনিটি থাকে না।
আসলে আমি একটু বোর হচ্ছি। আমার রিলেটিভ গেছে কাজে। বাসায় একদম একা। আপনি বুঝি খুব ব্যস্ত!

একদম না।
সত্যি বলতে কী ইকবাল একদম আশাই করেনি মেয়েটি এত দ্রুত ওকে ফোন করবে। সাধারনতঃ ইকবাল কিছু ব্যাপারে মোটামুটি কনফিডেন্ট। কিছু ঘটার একটা আগাম পূর্বাভাস অবচেতন মন থেকে পায়। সীমার ব্যাপারটা একদম মাথায় ছিল না।
চলুন না একটু ঘুরে আসি। আমি আছি ডোবার এভিনিউতে। আমার এখান থেকে হাঁটা পথ বোট ওয়াক।
ওকে। আমি আসছি। আপিনি নিচে নেমে আসুন।
ইকবাল পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওর মার্সিডিজ বেঞ্জ চালিয়ে এসে পরলো।
গাড়ি পার্কিংএ রেখে দু'জনে হেটে চলে এলো বীচে।
সময়টা জুনের শেষ। পাঁচটার মতো বাজে। মাথার উপর গনে গনে সূর্য। বেশ গরম। মনে হয় এখন জোয়ার। বেশ বড় বড় ঢেউ উঠছে। পায়ের কাছে এসে আছড়ে পড়ছে ফেনিল জলরাশি। স্বল্পবসনারা রৌদ্রস্নান করছে বালুকা বেলায়। কেউ কেউ উদোম বুকে সূর্যের আলো মাখছে গায়ে। ছোট ছোট বাচ্চারা অনেকদুর পর্যন্ত চলে গছে। আটলান্টিকের তীরে এসে মনটা আকুল হয়ে উঠলো মুহূর্তে। যখনই সমুদ্রের কাছে আসে ইকবাল কেনো যেনো মনটা উদাস হয়ে যায়। সমুদ্রের বিশালতার কাছে নিজেকে মনে হয় বড়ই ক্ষুদ্র আর অপাংক্তেয়।
উথাল পাথাল হাওয়ায় সীমাকে কী অপূর্বই না লাগছে। সীমা জীন্সের প্যান্টের সাথে হাতের কাজ করা ফতুয়া পড়েছে। খোলা চুলগুলো উড়ছে। ছড়িয়ে পড়ছে মুখে। কানে ছোট্ট দুটো ডায়মন্ড। রোদের আলো পড়ে ঝিকিয়ে উঠছে। পায়ে চপ্পল। তীব্র বাতাসে ওর সুনিল বক্ষদ্বয় কেমন স্ফুট হয়ে ফুটেছে। যেনো দুটো পাখীর বাসা। ইকবাল কালো সর্টসের সাথে সাদা ধবধবে এডিডাসের রাউন্ড গলার টীসার্ট পড়েছে।
কী সুন্দর না! জানেন আমি কখনও সমুদ্রের কাছে আসিনি।
যাহ্।
সত্যি বলছি। গঙ্গার কাছে গিয়েছি কিন্তু সমুদ্রের কাছে যাওয়া হয়নি। আমি আসলে বাংলাদেশ নেপাল ছাড়া আর বেশী কোথাও যাইনি
আচ্ছা সীমা আমাকেই কোনো ফোন দিলেন!
এমনি। আপনার সাথে কথা বলে ভালো লাগলো তাই। বিদেশে যার সাথেই পরিচয় হয় দেখি কেমন যেনো। সবাই নিজেকে এতো বড় ভাবে! কালকের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ থেকে যে শিল্পীরা এসেছে সবাই তাদের নিয়ে ব্যস্ত। কর্মকর্তারা এমন করছে যে দেখলে হাসি পায়। সবাই নিজেকে ওইসব শিল্পীদের সবচেয়ে কাছের মানুষ প্রমান করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে।
আপনি ঠিক ধরেছেন। কিছু লোক আছে দেখবেন কবি সাহিত্যিক বা কোনো বিশিষ্ট লোক এলে নিজের পকেটে পুরে ফেলতে চায়। একটা লুকোচুরি খেলায় মেতে উঠে। বেশী কারো সাথে যাতে দেখা সাক্ষাৎ না হয় সেই চেষ্টা থাকে। সবাই বড় মাতবর সেজে বসে। সরি সীমা। আপনার জানার জন্য এসব বললাম।
ইটস ওকে। আমি বুঝে গেছি। শুনুন আমাকে তুমি করে বলবেন।

থ্যাংকস। এতো সুন্দর জায়গায় এসে কাউকে আপনি করে বলা যায়!
আমি কিন্তু আপনি করে বলবো ঠিক আছে!
কেনো!
আমার ইচ্ছে।
সেটা হবে না। দু'জনকেই তুমি করে বলতে হবে।
এমা আমি পারবো না!
বন্ধুকে কেউ আপনি বলে শুনিনিতো! বলেই ইকবাল সীমার হাত ধরলো। কী পেলব হাতের স্পর্শ! কিছুক্ষন নিরবে হাটলো দু'জন। সমুদ্রের ফেনিল উচ্ছাসের শব্দে সীমার বুকের ধুক ধুক শব্দ চাপা পড়ে যাচ্ছে। ওর এতো ভালো লাগছে! সূর্যটা সমুদ্রের উপর কোনাকুনিভাবে আলো ছড়াচ্ছে। একটি খোলা বুকের ময়েকে দেখে সীমা তীর্যকভাবে ইকবালের দিকে তাকালো।

৪.

টরন্টোতে সীমার সাথে এভাবে দেখা হয়ে যাবে ভাবেনি ইকবাল। জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যা মানুষের ভাবনাকেও হার মানায়। আটলান্টিক সিটিতে দুই বছর আগে সেই কনসার্টে পরিচয় হওয়ার পর এমন ভালো লেগেছিল সীমাকে! এত ভাললাগা আর ভালবাসা কোথায় যে হারিয়ে যায়! কোনো ভালবাসা চিরস্থায়ী হয় না! নিউইয়র্ক ফিরে এসে একটানা ছয়মাস কতবার ওদের দেখা হয়েছে। ঘুরেছে বেড়িয়েছে! একটা অদ্ভুত ভালোলাগা তৈরী হয়েছিল সীমার জন্য। এই যে স্বামী-স্ত্রীরা একসাথে দীর্ঘজীবন কাটিয়ে দেয় কিভাবে সেটা সম্ভব! এত টানাপোড়েন, এ অমিল, এত বৈপরীত্য থাকার পরও কিভাবে একত্রিত জীবন বুঝে পায় না ইকবাল। তারচেয়ে এই কি ভালো নয় একাকী থাকা! ইকবালকে কেউ তো আসলে শেষ পর্যন্ত কাছে টেনে নেয়নি! নাকি ইকবালই কাছে আসা মানুষদের আকড়ে থাকতে পারেনি! কোনটা যে সঠিক সেটাই ইকবাল আজও জেনে উঠতে পারলো না।

বাইরে থেকে আপাত অনেক সুখী দম্পতি দেখেছে ইকবাল কিন্তু আসলে তারা ভিতরে এতটাই অসুখী যে সেটা তারা কারো শেয়ারও করতে পারে না। ইকবালের খুব ঘনিষ্ট একটা দম্পতি আছে যাদের দেখলে সবাই সুখী ভাবে। মনে করে আহা এর চেয়ে সুখী দম্পতি আর হয় না! অথচ ইকবাল জানে এরা কতটা অসুখী। ওরা প্রায় ইকবালের কাছে একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। এমনকি স্বামীটি তার পরমা সুন্দরী স্ত্রীকে মারধোর পর্যন্ত করে। এর অর্ন্তনিহিত কারন ইকবালের জানা নেই। একমাত্র স্ত্রীই তার স্বামীকে ভালো চেনে আর স্বামী চেনে তার স্ত্রীকে! বিদেশের মানুষের অতি আত্মমর্যাদার এই দিকটি ভাঙ্গনের পথকে সুগম করছে। তাই ইকবাল এসব দেখে দেখে শঙ্কিত বিবাহিত জীবন সম্পর্কে!

সব মানুষেরই একটা নিজস্ব জগৎ আছে। একটা স্বাধীন সত্ত্বা আছে। এমনকি বিবাহিত হওয়ার পরও সেটা থাকতে পারে। কিন্তু প্রায়শঃই এই স্বাধীন সত্ত্বাটিকে বিবাহিত জীবনে কেউ কাউকে স্বীকৃতি দিকে চায় না। তখনই সমস্যা তৈরী হয়। এখন প্রশ্ন হলো সুখী একাকী জীবন ভালো না অসুখী দ্বৈত জীবন ভালো! তবে দিল্লীকা লাড্ডু সবাই খেয়েই পস্তায়। এর থেকে পরিত্রানের কোনো উপায় নেই।

সীমা ব্যানার্জীকে আজকে আরো সুন্দর লাগছে। শ্যামলা রঙের মেয়েটিকে বেশ ঝক ঝকে দেখাচ্ছে আজকে। এপ্লিক ও সিকোয়েন্সের কাজ করা অফহোয়াইট শাড়িতে বেশ মানিয়েছে সীমাকে। ম্যাচিং স্লীভলেস ব্লাউজ, চুড়ি, কানের দুল এবং গলায় মালা।

ইকবালকে দেখে সীমা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো না। ব্যাপারটা ইকবালের ভালো লাগলো। অনেকেই এটা করে। যখন বিয়ে হয়ে যায় তখন অতীত ভুলে যায়। সঙ্গত কারনেই। এমন হয়েছে যে যেনো কোনো দিন দেখাই হয়নি। ইকবাল অবশ্য তাতে মাইন্ড করে না। সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইকবাল একশতভাগ সৎ। সে তার জীবনের বিনিময়ে হলেও অন্যের মর্যাদা রক্ষার করে।

কেমন আছো!

ইকবাল উজ্জল হেসে বললো, ভালো। তুমি কেমন আছো!

ভালো আছি খুউব। পরিচয় করিয়ে দেই, আমার স্বামী।

হ্যালো। আমি প্রদীপ।

দেখেই বুঝেছি এত হ্যান্ডসাম লোকটি তোমার স্বামী না হয়েই যায় না।

প্রদীপ বললো, আপনার কথা অনেক শুনেছি!

ইকবাল চমকে যাওয়ার ভান করে বললো, কী শুনেছেন! এই সীমা তুমি কী সব সিক্রেট বলে দিয়েছো!

প্রদীপ হেসে বললো, আপনিতো মশাই রমনীমোহন লোক!

সেইজন্যইতো সুকন্ঠী আর মিষ্টি চেহারার মেয়েটিকে কেড়ে নিয়েছেন।

কেড়ে নিইনি। জয় করে নিয়েছি।

ইউ আর লাকি! সীমা খুব চমৎকার মেয়ে।

সীমা মনে মনে খুব খুশী হলো ইকবাল ওর সম্পর্কে ভালো মন্তব্য করায়। এটা ঠিক যে ইকবালের সাথে ওর একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কিন্তু নানা কারণে সেটা আর ঠিক থাকেনি। এজন্য ইকবালই দায়ী।

তালাত আজিজের কনসার্ট শেষ। লোকজন বেড়িয়ে যাচ্ছে। কামাল ওর জন্য অপেক্ষা করছে।

তুমি কবে এসেছো টরন্টো!

এইতো পরশুদিন।

একদিন আসুন আমাদের বাসায় আড্ডা দেয়া যাবে, বললো প্রদীপ

হ্যা আসো। সীমা ফোন নম্বর দিলো ইকবালকে।

তুমি কতদিন কানাডায় এসেছো!

বছর দেড়ে হবে।

দেখেছেন আপনার স্ত্রীটি কেমন মানুষ। আমাকে বিয়ের দাওয়াত পর্যন্ত দেয়নি। আমি কী বিয়ে ভেঙ্গে দিতাম!

প্রদীপ হেসে বললো ওর হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আপনি কতদিন থাকবেন!

যতদিন রাখবেন!

ওকে ফাইন। কালকে শনিবার হোল ডে আমার বাড়িতে ঠিক আছে!

আমার কোনো অসুবিধা নাই। আপনার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করুন তার কোনো অমত আছে কিনা আমাকে দাওয়াত করতে।
এই তুমি বেশী বেশী ঢং করছো। উঠেছো কোথায় সেটা বলো!
ইকবাল ওর বন্ধুর সাথে ওদের পরিচয় করিয়ে দিলো। আমার বন্ধু কামাল। বে ভিউ নামক জায়গায় থাকে ৩০০০ স্কয়ার ফুটের বাড়িতে। প্রচুর চুরি করেছে দেশে। এখন আরাম আয়েশে আছে। বিএম ডব্লিউ চালায়। আমিও আছি রাজার হালে।
কামাল বললো ওর কথা একদম বিশ্বাস করবেন না।
প্রদীপ বললো কালকে আসেন আমার ওখানে।
কামাল বললো, এরচেয়ে আপনারাই আমার বাড়িতে চলে আসেন। খালি বাড়ি। আরো কয়েক জনকে বলবো ইকবালের আসা উপলক্ষ্যে।
৫.
সীমা কবে বিয়ে করেছে কিছুই জানেনা ইকবাল। সীমা খুবই অদ্ভুৎ আচরন করেছিল ইকবালের সাথে। কিছুদিন দু'জনে এতটা কাছে এসেছিল! হঠাৎ কী হলো। ইকবাল ফোন করলে ফোন পর্যন্ত ধরতো না। ই-মেইল করলে রিপ্লাই দিতোনা। অথচ শুধু ইকবালের জন্য আলাদা ই-মেইল একাউন্ট খুলেছিল সীমা। সম্ভবত সীমার তখন বিয়ে হয়ে গেছে বলেই ইকবালকে এভায়েড করতে শুরু করে। এটা না করলেও পারতো সীমা। ইকবালের খুব খারাপ লেগেছিল। ওর শুধু জানতে ইচ্ছে করছিল ওর দোষটা কোথায়! কেউ একজন সম্পর্ক নাই রাখতে পারে। কিন্তু সেটারতো একটা কারণ থাকবে! সীমা ওর জীবনের সব ঘটনা ইকবালকে বলতো। কোলকাতায় একজন ডাক্তারের সাথে ওর সম্পর্ক ছিল। ডাক্তার লোকটি ছিল বিবাহিত। এটা জেনেও সীমা তাকে পেতে চয়েছিল। সীমা ইকবালকে বলেছিল, আমি কখনই তোমাকে বিয়ে করবো না। তুমিও বলবে না, ভালোবাসি। আমরা শুধু বন্ধু হয়ে থাকবো। কোনো কারণে বন্ধুত্বও না থাকতে পারে বুঝেছো! এসব বলেছিল সীমা।
আটলান্টিক সিটি থেকে ফিরে আসার দশ দিনের মাথায় সীমা এসেছিল ইকবালের লং আইল্যান্ডের বাসায়। ইকবাল বাসায় ছিল একা। বাবু গেছে দোকানে।
ইকবাল সীমাকে ওর ঘরে নিয়ে বসালো। সীমা একটা চেয়ারে বসলো। সীমা বলেছিল ও মাঝে মাঝে ড্রিঙ্ক করে। ইকবাল ড্রিঙ্ক এনে রেখেছিল। সীমা স্মোকও করে। কলকাতার মেয়েরা এসব কেয়ার করে না। ইকবাল নিজে ড্রিঙ্ক নিলো। সীমাকেও দিল। তবে সীমা আজকে ড্রিঙ্ক নিলো না। ইকবাল জোর করলো না।
সীমা কিন্তু ইকবালের বাসায় আসতে চায় নি। ইকবালের পিড়াপিড়িতেই এসেছে। সীমা মেয়েটা একটু সরল টাইপ। এটা ইকবাল প্রথম দিনই বুঝে গেছে। তবে সীমা খুব জেদী মেয়ে।
ইকবালের ঘরটা শীতল। রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজছে ধীর লয়ে। একটা রোমান্টিক মতো পরিবেশ। প্রথম থেকেই সীমার মধ্যে একধরনের অস্বস্তি লক্ষ্য করছে ইকবাল। আজকে সীমাকে এত ভালো লাগছে যা বলার না। ইকবাল নিজেকে স্বাভাবিকই রাখতে পারছে না। আসলে এটা যতটা না

ভালো লাগা তারচেয়ে বেশী একধরনের আকাঙ্খা। সীমা এসেছও খুব সাধারন বেশবাসে। একটা জীন্সের প্যান্টের সাথে লাল রঙের এমব্রয়ডারি করা ফতুয়া।
তোমাকে এত ভালো লাগছে আমার সীমা।
সীমা শুধু বললো আমি বেশীক্ষন থাকবো না।
কেনো সীমা!
তুমি আসতে বলেছো তাই এলাম।
ড্রিঙ্ক করো!
না।
'না' কথাটা সীমা বেশ জোরের সাথে বললো।
সীমাকে রাগাতে চায় না ইকবাল। তাই কিছু বলল না।
তোমার পা দু'খানি বড়ই সুন্দর, বলেই সীমার পায়ে হাত দিল ইকবাল।
সীমা চট করে পা সরিয়ে নিয়ে বলল, এসব কী করছো! পায়ে হাত দিচ্ছ কেনো! এটা খুব খারাপ।
কী খারাপ!
পায়ে হাত দিতে নেই।
তাতে কি! আমার অনেক ভাল্লাগছে।
আমি আজকে যাই।
না সীমা!
আমার ভাল্লাগছে না।
প্লীজ থাকো।
কেনো থাকবো!
এমনি থাকো।
সীমা উঠে দাঁড়ালো চলে যাওয়ার জন্য।
ইকবালের তখন এমন অবস্থা যে সীমাকে সে কিছুতেই যেতে দিতে পারে না। আর যদি সীমা কোনোদিন না আসে! আর আসবে কি! খুবই অনিশ্চিত সে সব।
সীমা জেদ ধরেছে সে চলে যাবে। সে বুঝলো এইভাবে তার চলে আসা ঠিক হয়নি। ইকবালই বা তাকে কেনো আসতে বললো! দুজনের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার। ইকবাল একটু ড্রাঙ্ক মতো হয়েছে। আবেগ তার বুকের মধ্যে উথাল পাথাল করছে। সীমার কোনো প্রতিরোধই টেকার কথা না। তবুও ইকবাল নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে। সীমা বুঝে গেছে আজকের অনিবার্যতার কাছে তার আত্মসমর্পন করা ছাড়া উপায় নেই। তবুও সে তার জেদ বজায় রাখতে চায়। আজকে সে এসবের জন্য প্রস্তুত নয়। একটা ঝোঁকের মাথায় চলে এসেছে।
ইকবাল করলো কী সীমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে ঠোঁটে গলায় বুকে চুমু খেতে থাকলো।
সীমা যতই বাধা দিক কিন্তু ইকবাল সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। সে বুঝতে চায় এটা কী সীমার মনের কথা! নাকি বলার জন্য বলা! মেয়েরাতো এ রকম করেই। মেয়েদের শেষ পর্যন্ত বোঝা যায়না।
৬.

বে ভিউতে কামালের ধুন্ধুমার বাড়ি। এ এলাকাটা টরন্টোর ধনীদের এলাকার একটি। কামাল কিছুই করে না। জাস্ট বসে বসে টাকা উড়ায়। একজীবন বসে বসে খেলেও ওর টাকা শেষ হবে বলে মনে হয় না। কামাল ইকবালের চেয়ে বয়সে কিছু বড়। আপাততঃ সে দেশে যাচ্ছেনা। পরিস্থিতি অনুকুল হলে আবার যাবে। দেশে না গেলেও কোনো অসুবিধা হয় না। সব সেটআপ করাই আছে। কামাল হচ্ছে টাকার মেশিন। এত টাকা দিয়ে কী ভাবে কে জানে। বেশীরভাগ সময় ঘুরে বেড়ায়। আজ আমেরিকা, কাল ইউরোপ, পরশু দুবাই। বাংলাদেশ হচ্ছে পয়সাওয়ালাদের জন্য জান্নাতুল ফেরদৌস। যদি একবার টাকার সোর্স তৈরী হয়ে যায় তাহলে এরচেয়ে সুখের আর কিছু নেই। কামালের নানা ধরনের দুই নম্বর ব্যবসা আছে। ব্যবসার জন্য যে ধরনের কিলার ইন্সটিঙ্কট থাকা দরকার কামালের তা আছে। তবে কামাল অন্যদের চেয়ে একটু আলাদা, এই কারনে যে আরো অনেক বড় বড় চোর বিদেশে টাকা পাচার করেছে। চোর হলেও তাদের দেমাক আছে। কামালের তা নেই। কামাল বিনয়ী ও ভদ্র। এটিকেট জানে। হতে পারে কামাল আমেরিকায় লেখাপড়া করেছে বলে এগুলো শিখেছে। কিছু অশিক্ষিত লোক বিদেশে এসে হঠাৎ টাকা পয়সার মুখ দেখে ধরাকে সারাজ্ঞান মনে করে। যদিও এসব টাকা পয়সার উৎস অজানা। কামালের সাথে অনেক ব্যাপারেই ইকবালের চিন্তার বৈপরিত্য আছে কিন্তু তা সত্ত্বেও ওদের বন্ধুত্ব হতে কোনো অসুবিধা হয়নি। আমেরিকায় ওরা দু'জন একসাথে অনেকদিন কাটিয়েছে। তখনও কামাল দু'হাতে পয়সা উড়াতো। পড়াশুনা শেষ করে বাবার ব্যবসায় বসে যায়। কামালের বাবা একটার্ম মন্ত্রী ছিল। মন্ত্রী থাকাকালীন শত শত কোটি টাকার মালিক বনে গেছে।
আজকে যারা পার্টিতে এসেছে তারা প্রত্যেকেই মানি সেন্ট্রিক। এরা যে আম জনতার সাথে মেশেনা তা বোঝা যায়। এরা থাকে নিভৃতে। এদের জাত আলাদা। কোনো সমিতি বা পিকনিকে এদের দেখা যায় না। পত্রিকায় ছবি ছাপা হয় না। এদের অনেকেরই মিলিয়ন ডলারের ব্যবসা, বাড়ি, গাড়ি আছে। কামালের বাড়িখানা সত্যিই দেখনসই একখানা বাড়ি। বাড়ির সামনে দুটো লেটেস্ট মডেলের বিএমডব্লিউ গাড়ি। একটা কামালের আর একটা ওর বউর। কামালের বউ গেছে ভাইয়ের কাছে ফ্লোরিডা বেড়াতে। তিন বছরের মেয়েকে নিয়ে। এতবড় বাড়িতে কিভাবে যে তিনটা মানুষ থাকে কে জানে! পাটি ফার্টি লেগেই থাকে কামালের বাড়িতে।
বিশাল ডাঞ্চ ফ্লোরে এখন সবাই উত্তাল নৃত্যে মেতে আছে। বার কেবিনেট থেকে কামাল ড্রিঙ্ক সার্ভ করছে। নানা ধরনের দামী দামী সব ড্রিঙ্ক। সীমা আর প্রদীপ কামালের বিত্তের দাপট দেখে একটু ভড়কে গিয়েছিল। কিন্তু কামাল সহজেই ওদের আপন করে নিয়েছে। সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। ওদের মধ্যে যাতে কোনো কমপেক্স কাজ না করে সেজন্য এটা করেছে। সীমা কিন্তু ভালো ডাঞ্চ করে। ওর গান শুনে সবাই মুগ্ধ। প্রদীপ আজকে প্রচুর ড্রিঙ্ক করেছে। সে একটু টলছে বোঝা যায়। ইকবাল যতই ড্রিঙ্ক করুক সে কখনও তার নিয়ন্ত্রন হারায়না। যারা ড্রাঙ্ক তাদের কেউ কেউ থেকে যাবে আজকে রাতে। এই শহরে ড্রিঙ্ক এ্যান্ড ড্রাইভ নিষিদ্ধ। জিরো টলারেন্স।
ইকবাল সীমার কানের কাছে গিয়ে বলল তুমি কীএকটু উপরে আসবে! কথা আছে।
সীমা মাথা নেড়ে না বললো।
প্লীজ।

অগত্যা সীমা উপরে উঠে এলো। ওরা দু'জনে একটা সুসজ্জিত রুমে ঢুকলো। সীমা একটু একটু টলছে। হাতে সিগারেট। ইকবাল সিগারেটটা হাত থেকে নিয়ে ছাইদানিতে চাপা দিল। প্রদীপ কিছু মনে করবে নাতো!

হু কেয়ার!

তুমি সুখী সীমা!

তাতে তোমার কী যায় আসে!

প্রদীপ কী কিছু জানে!

কোন বিষয়ে!

আমাদের কথা!

জানলে জানে। আমি কেয়ার করি না।

তুমি অনেক বদলে গেছো সীমা!

তুমি খুব খারাপ মানুষ। খুউব!

কেনো আমি কী করেছি!

তোমার জন্য আমি কি না করেছি। আমার সবটুকু তোমাকে উজার করে দিয়েছি। দিনের পর দিন। তুমি একটা বাজে মানুষ। তোমার ভিতর আসলে হৃদয় বলে কিছু নেই।

তুমিইতো যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছিলে। আমি অনেক চেষ্টা করেছি তোমার সাথে যাগাযোগ করতে।

তুমি খুউব খারাপ! স্বার্থপর। তোমাকে আমার চেনা হয়ে গেছে।

তোমার মতো ছেলেরা কখনো বিয়ে করতে পারবে না। তুমি শুধু মেয়েদের রূপে ভোলো। শরীরটাই তোমার কাছে আসল।

তোমার কথা ঠিক না। তোমাকে আমি খুব মিস করি।

জানি। আমার শরীরটা তোমার খুব প্রিয় ছিল।

এসব কি বলছো!

আমি যে ঠিক বলছি তা তুমি জানো। তোমার মধ্যে ভালোবাসা বলে কিছু নেই। অনেক মেয়েদের সাথেই তুমি বন্ধুত্ব পাতিয়েছো। আবার তাদের ভুলে গেছো।

তুমিইতো বলেছিলে আমরা শুধু বন্ধু হবো। ভালোবাসার কথা না বলতে।

শাটআপ! জাস্ট শাটআপ! আই হেট উই। বলে সীমা কেঁদে ফেললো।

ইকবাল সীমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো।

আই্এ্যাম সরি সীমা। ইকবাল ফিস ফিস করে বললো। সীমা ইকবালের বাহু বন্ধন থেকে ছুটতে চেষ্টা করছে। এ্যালকোহলের কারনে সীমার নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই। ইকবাল সীমার মুখটা তুলে ওর ঠোঁটে চুমু খেলো। গভীরভাবে চুমু খেলো।

আমাকে ছেড়ে দাও।

না। একটু থাকো।

না! প্রদীপ নিচে আছে। বলে সীমা নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। তুমি আমার অনেক ক্ষতি করেছো।

কী ক্ষতি করেছি বলো।
আমি কিছু বলবো না।
৭.
সীমার আচরনে ইকবাল বড়ই অবাক হলো। পরশুদিন যেভাবে আচরন করেছে আজকের সাথে তার কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছে না। সীমা বরাবরই এরকম। খুবই অদ্ভুৎ। ও যে কখন কী মুডে থাকবে তা বোঝা যায় না। একটু স্টবার্ন। আবার যখন ভালো মুডে থাকে তখন সবটুকু দিয়ে দেয়। বিয়ের পর সীমা হয়ত পুরোটাই বদলে গেছে। কে জানে। মেয়েদের মন বোঝার সাধ্য বজলুর নেই। মেয়েদের এই অনিশ্চিত আচরনের কারণেই ইকবাল শেষ পর্যন্ত কাউকে আপন করে পেলো না।
সীমা যে অভিযোগ করেছে তাকি সত্যি! ইকবাল কী সত্যি কাউকে বিয়ে করতে পারবে না! ইকবাল কেনো কাউকে বালোবাসতে পারে না! কেনো কারো জন্য মন পাগল হয় না!। ভালোবাসলে যে রকম মরে যেতে ইচ্ছে করে কারো জন্য সে রকম কেনো হয় না! কেনো সব সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত শরীরে গিয়ে সমাপ্তি ঘটে!
ইকবাল মাত্র সপ্তাহখানেক থেকেছিল টরন্টো। টরন্টোতে সবার সাথে শেষ পর্যন্ত যোগাযোগ করা হয়নি। তবে একটি ঘটনা খুব মনে পড়ে। যখনই আসে।
বছর চারেক আগের ঘটনা সেটা। টরন্টোর এক মেয়ের সাথে প্যালটকে যোগাযোগ। মেয়েটি ছিল খুবই ডেসপারেট টাইপ। কয়েকদিনের যোগাযোগেই সে ইকবালকে ভালোবেসে ফেললো। কতটা সত্যি ইকবাল জানে না। মেয়েদের ভালোবাসার ব্যাপারে ইকবাল বরাবারই সন্দিহান। নাছারবান্দা মেয়েটি ইকবালের মুখ থেকে 'ভালোবাসি' কথাটা না শুনে ক্ষান্ত দিচ্ছিল না। ইকবালকে শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলতে হয়েছিল ভালোবসি।
এভাবে চলছিল দিন। ইকবাল মজাই পাচ্ছিল। একধরনের ভালোবাসা ভালোবাসা খেলা। প্রতিদিন ই-মেইল যোগাযোগ তো হতোই আবার ফোনেও কথা চলতে লাগলো। অনেক কথা হতো। এমন কোনো বিষয় নেই যা নিয়ে ওরা কথা বলতো না। এরোটিক কথা বলতেই বেশী পছন্দ করতো মেয়েটি। ইকবালকে প্রেমের দীক্ষা দেয়ার একটা মিশন নিয়েছিল। মাঝে মাঝে কাঁদতো। একটা দুঃখ তার ছিল। কখনো কখনো বলতো। মাঝে মাঝে উদাস হয়ে যেতো। ইকবালের মন নরম হয়ে যেতো। মেয়েটি ইকবালের চেয়ে দু'তিন বছরের বড় ছিল। তাতেও কোনো অসুবিধা ছিল না।
মেয়েটি একদিন ইকবালের জন্য টিকেট পাঠালো টরন্টো আসার জন্য। এয়ারেপোর্টে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো রিসিভ করার জন্য। মেয়েটিকে দেখে ইকবালের সত্যি মাথা ঘুরে গিয়েছিল। খুব সুন্দর। সেটা ছিল জুন মাসের শেষ। টরন্টোর আবহাওয়ায় বড়ই সৌন্দর্য। বড়ই পেলবতা। চারদিকে কী সবুজ। মৃদুমন্দ সমীরন। বয়সের চেয়েও মেয়েটিকে কম মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল চব্বিশ পঁচিশ। সুন্দর করে সেজে এসেছিল।
যে এপার্টমন্টে নিয়ে এলো সেটা মেয়েটির নিজস্ব। সুন্দর করে সাজানো। দু'রুমের এপার্টমেন্ট। মেয়েটি গান খুব পছন্দ করে। ইকবাল ওর জন্য রাজ্যের সব গানের সিডি নিয়ে এসেছে। মেয়েটির একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে। প্রবাসের আর দশটার মতোই। গতানুগতিক। মেয়েটি ডিভোর্সড। তিন বছর আগে ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। মেয়েটি আর বিয়ে করেনি। পাঁচ বছরের একটি

ছেলে আছে। ওর কাছেই থাকে। মেয়েটির স্বামী ছিল বিশাল ধনী লোক। টাকার জোড়েই মেয়েটিকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু ভালোবাসা হয়নি। বয়সেও ছিল কমপক্ষে দশ বছরের বড়। সেটাও কোনো সমস্যা ছিল না। লোকটি ছিল ভীষণ বদরাগী। কথায় কথায় এক ধরনের মানসিক পীড়ন করতো। ওর দারিদ্রতা নিয়ে উপাহাস করতো। এমনকি এক পর্যায়ে গায়ে হাত পর্যন্ত তুলতে শুরু করলো।

মেয়েটি কেনো এটা মেনে নেবে! এটাতো কানাডা! একদিন পুলিশ এলো। ভেঙ্গে গেলো ছয় বছরের সংসার!

রানী খুব সৌখীন প্রকৃতির মেয়ে। রাজ্যের অদরকারী জিনিস কেনে। দু'হাতে পয়সা ওড়ায়। ভাল একটা চাকরী করে। ইকবাল তিনদিন রানীর বাসাতেই থাকবে।

তুমি আমাকে আসলে ভালোবসো না তাইনা!

রানীর কথা শুনে হাসলো ইকবাল।

হাসো কোনো!

এমনি।

না এমনি না। বলো ভালোবাসো কিনা!

ভালোবাসা কী জোর করে হয়!

এর মানে কী তুমি আমাকে ভালোবাসো না!

আরে না পাগল। তুমি অনেক ভালো। তোমাকে আমি অনেক লাইক করি! তুমি আমার রানী।

শয়তান! তুমি অনেক সুন্দর ইকবাল। আমার ধারণার চেয়েও।

তুমিও।

তুমি জানো না আতি কত একা। কেউ আমাকে বোঝে না।

আমি তোমাকে বুঝি।

ওরা দু'জন সোফায় খুব ঘনিষ্ট হয়ে বসেছে। রানীর মনটা খুব আলগা আজকে। ওর সুন্দর চোখ দিয়ে দু'ফোটা পানি গড়িয়ে পড়লো। আর যাইহোক মেয়েদের চোখের পানি ইকবাল একদম নিতে পারে না। ওর খুব খারাপ লাগে। ইকবাল ওর মুখটা তুলে ধরলো। রানী ইকবালের বুকে লুটিয়ে পরলো। ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলো। কেঁপে কেঁপে উঠছে মেয়েটি।

২০.

পৃথিবীতে সবচেয়ে জটিল বিষয় কী? কেউ যদি আমাকে এই প্রশ্নটি করে আমি নিদ্বিধায় বলবো সবচেয়ে জটিল হচ্ছে সম্পর্ক। অথচ এই জটিল কাজটিই মানুষ সবচেয়ে বেশী যত্ন নিয়ে, সবচেয়ে আবেগ নিয়ে গড়ে তোলে। পৃথিবীতে মানুষ বিচিত্র সব সম্পর্ক তৈরী করে। কিছু সম্পর্ক অবশ্য মানুষ জন্মসূত্রে পায়। একজন সম্পূর্ণ অচেনা মানুষ মহূর্তে আপন হয়ে উঠে। দূরের মানুষকে কাছে টেনে আনে। একে অপরের বুকের স্পন্দন শোনার জন্য কত ব্যাকুল থাকে। প্রেয়সীর উষ্ঞ বুকে মুখ রাখার জন্য কত ধুন্ধুমার কান্ড ঘটায় মানুষ। তারপরও সম্পর্ক কখনও সরল রৈখিক পথে চলেনা। এর সরল সমীকরনও কারা যায় না। সম্পর্ক হচ্ছে এক অন্তহীন সমান্তরাল যাত্রা।

আমরা সম্পর্ক নিয়ে যত কিছুই করিনা কোনো পৃথিবীতে কোনো সম্পর্কই স্থায়ী না। পৃথিবীতে আসলে কেউ কারো না। প্রতিটা মানুষ ভীষনভাবে একা। এই যে বাবা-মা স্ত্রী সন্তান বন্ধু প্রেয়শী এসবই হচ্ছে এক মায়া, এক ধুধু মরীচিকা। স্টীমার ছেড়ে যাওয়ার পর স্টেশনটি যেমন একা পড়ে থাকে, ধু ধু বালিয়াড়ি, মানুষ হচ্ছে তেমনই একা। যতই আমরা মানুষ পরিবেষ্টিত হয়ে থাকি না কেনো, কোনো নিঃসঙ্গ একাকী মুহুর্তে নিজের মুখোমুখি হলে তবে বোঝা যায় মানুষ কতটা একা। পার্টি ভেঙ্গে যাওয়ার পর শূন্য বাড়িতে যেমন একা হয়ে যায় মানুষ অথবা সঙ্গম শেষে যেমন নিসঙ্গতা আকড়ে ধরে। বেশীরভাগ মানুষ নিজেকে জানে না; জানার চেষ্টাও করে না। ভাবে এইতো জীবন কত সুন্দর, কত মায়ায় ভরা। কত আনন্দের উপকরণ চারদিকে! কত স্তুতি, কত তোষামুদি! বেঁচে থাকা কী ভীষন অর্থপূর্ণ। এটা ঠিক যে মানুষ হয়ে জন্মানো পশুর চেয়ে উত্তম। কারণ মানুষ হয়ে জন্ম হয়েছে বলেই পৃথিবী এত যন্ত্রনাময়। পশুর অন্তত মানুষের মতো অন্তহীন দুঃখ কষ্ট নেই। মানুষের জন্মই হয়েছে দুঃখভোগের জন্য। ব্যথা বেদনা, জ্বরা খরা, হাহাকার, হা হুতাশ হচ্ছে মানুষের নিয়তি। সুখ সুখ বলে মানুষ যে এত চেচায়; শেষ পর্যন্ত সুখ নামক সুখ পাখিটা অধরাই থেকে যায়। সম্পর্ক নিয়ে যে এত তড়পায়, এত আর্তনাদ করে, শেষ পর্যন্ত মানুষ কী এসব স্থায়ী রুপ দিতে পারে? এত আবেগ আর তীব্র রিরংসা নিয়ে যে সম্পর্ক তৈরী হয় তা কোনো তাহলে ভেঙ্গে যায়? কেনো স্থায়ী হয় না?

দীর্ঘ একত্রিত জীবন কেনো ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায় ? কেনো দু'জন মানুষ দু'দিকে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায় চিরদিনের জন্য? ভেঙ্গে ফেলার জন্যই কি! মানুষ যতই আত্মসুখে সুখে বিভোর হোক, যতই অহং আর ভড়ং নিয়ে থাকুক মানুষ তার নিজের পরিণতি জানেনা।

জানো রানী অনেক ভালো ভালো সম্পর্ক ভেঙ্গে যেতে দেখেছি। একটানা চল্লিশ বছর একসাথে থাকার পরও ভেঙ্গে গেছে সম্পর্ক। বুঝতে পারেনি একে অপরকে। দু'জন অচেনাই রয়ে গেছে পরস্পরের কাছে। মানুষ কত বদলে যায়। এক সময় একে অপরের জন্য প্রান দিতে চাইতো এমনই ছিল প্রগাঢ় প্রেম, অথচ সময়ের বিবর্তনে এক অপরের প্রাণ সংহার করতেও দ্বিধা করে নি। সময়ের পলিমাটি পড়ে সম্পর্কগুলো এভাবেই ধুসর হয়ে যায়।

মানুষের সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা হচ্ছে কি জানো? মানুষ একে অপরকে খুব কমই বোঝে। আমরা দাবী করি যে আমি তাকে বুঝি, কিন্তু আসলে মানুষ নিজেকেই বোঝে না। এজন্যেই পৃথিবীতে সম্পর্ক নিয়ে এত টানাপোড়েন। আমি নিজেই কত জনার সাথে গড়ে তুলেছি সম্পর্ক! মনে হয়েছে আহা কী আনন্দ! কী মধুর সবকিছু! তাকে মনে হয়েছে স্পেশাল। অন্যদের চেয়ে আলাদা। কিন্তু পরক্ষনেই মনে হয়েছে এ যে অতি সাধারণ! আমিতো একে চাইনি! অথবা নিজেকেই মনে হয়েছে তার অযোগ্য। এই টানাপোড়েন কিছুতেই যায়না, অহর্নিশ সাথে সাথে চলে। কিছুতেই আশা ছেড়ে যায় না। আবার গড়ে উঠে সম্পর্ক। আবার ভাঙ্গে। মানুষের মতো এতো আনপ্রেডিক্টেবল প্রানী আর নেই। তাইতো মানুষকে বোঝা যায় না। এই শূন্যতা, এই হাহাকার, এই অন্ধকার নিয়েই জীবন। অনেক বক্তৃতা করলাম। তুমি কী টায়ার্ড আমার কথা শুনতে শুনতে!

কিছুটা। তবে তোমার কথা অনেকটা ঠিকও বটে। আমি আবেগপ্রবন মানুষ। বেশী কঠিন বাস্তবতা নিতে পারি না। আমার কেনো যেনো মনে হচ্ছে তোমার সাথে আমার সম্পর্ক টিকবে না।

এটা কেউ বলতে পারে না।
ভালোবাসা কিসের উপর টিকে থাকে বলোতো!
এটা খুব জটিল একটা বিষয় আমার কাছে।
আমি যদি তোমার কাছে থেকে দূরে থাকি আমি জানি আমার প্রতি তোমার আগ্রহ কমে যাবে।
আবার যকি কাছে আসি তাতেও আগ্রহ কমে যাওয়ার আশংকা থাকেবে। তাহলে কোনটা সঠিক!
আসলে কি জানো ছেলেদের ধরে রাখা খুব কঠিন কাজ।
প্রথম দিন রাতে বজলুর বুকে শুয়ে শুয়ে গল্প করছিল রানী।
বজলু বললো তেমনি মেয়েদের ধরে রাখাও কঠিন কাজ।
শোনো মেয়েদের তোমরা বোঝেনা বলেই এই কথা বলো। বেশীরভাগ মেয়েরাই চায় তার প্রিয়তমকে চিরদিনের জন্য পেতে। কিন্তু লোভী পুরুষরা সেটা বুঝতে পারে না। তারা কথার যাদু দিয়ে মেয়েদের ঘায়েল করে। তারপর মধু লুটে চলে যায়।
বজলু রানীর বাসায় তিনদিন ছিল। প্রথমদিন রানী যতটা আবেগাপ্লুত ছিল বজলুকে নিয়ে পারবর্তী দু'দিন রানী ছিল খানিকটা নির্লিপ্ত। বজলু এর কারণ উদ্‌ঘাটন করতে পারে নি। রানী যতটা না বজলুকে নিয়ে তারচেয়ে বেশী ওর ছেলেকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল। প্রথমদিন রানী অনেক কেঁদেছিল। বজলুকে জড়িয়ে কেঁদেছিল। বজলু ওকে অনেক আদর করেছে। রানী বাধা দেয়নি। বরং রানীই ওকে বার বার আমন্ত্রন করেছে। উন্মত্ত হয়েছিল রানী। সব প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল রানী। বিকেলে ওকে নিয়ে গিয়েছিল ব্লাফার্স পার্কে। সুন্দর জায়গাটা। বজলুর খুব ভালো লেগেছিল। একদিকে উঁচু একটু পাহাড়ের মতো আর অন্যদিকে দিগন্তবিস্তৃত লেক। মৃদুমন্দ সমীরন। রানী পড়েছিল অফহোয়াইট রঙের শাড়ি। রানী কাঁদছিল বলেই বজলু বললো, কোথাও ঘুরিয়ে নিয়ে আসো আমাকে।
ঘরে ফিরে রানীর হাতে রান্না করা খাবার খেলো বজলু। বোঝা যায় রানী তত পটু না রান্নায়। কিন্তু সে যথেষ্ঠ আন্তরিকতা নিয়ে করেছে।
বজলু ফিরে গিয়ে রানীকে ফোন দিয়েছিল কিন্তু বজলুর সাথে খুবই রূঢ় আচরণ করেছিল। বজলুর এর কারণটা জানার জন্য বারবার অনুরোধ করেছিল কিন্তু রানী আরো বেশী অপমান করেছিল বজলুকে। পরের বছর আবার যখন টরন্টো এসেছিল তখন রানীর সাথে দেখা করেছিল। ওর পায়ের কাছে বসেছিল। ওর ঠোটে চুমু খেতে চেয়েছিল। রানী বজলুকে খুবই তাচ্ছিল্য দেখিয়েছিল। ওটাই ছিল ওদের শেষ দেখা। এরপর আর কোনোদিন দেখা হয়নি, কথাও না।
পরে অবশ্য জেনেছে এটাই রানীর স্বভাব। এরকম গন্ডায় গন্ডায় ছেলেবন্ধু ওর আছে। পোষাক বদলের মতোই পুরুষ সঙ্গী বদলায় রানী। এজন্যই ওর সংসার টেকেনি। কথার যাদু দিয়ে বরং রানীই পুরুষ সঙ্গী শিকার করতো। এজন্য রানী মোটেই অনুতপ্ত ছিল না। রানীর কান্নাও আসল ছিল না। পুরুষ সঙ্গীরা রানীর জন্য অনেক কিছু করবে এটাই ও চাইত। ওকে দামী গিফট দেবে, দামী রেষ্টুরেন্টে খাওয়াবে। বজলুর এগুলোতে বোধহয় কিছু ঘাটতি ছিল। তাছাড়া বজলু টাকা দিয়ে কোনো মেয়ের সাথে বন্ধুত্ত্ব পাতাতে চায়না। ওর বন্ধুত্ত্ব হবে স্বার্থহীন। মুক্ত। ভালোলাগা তৈরী হলে সবটুকু দেয়া যায়। টাকা দিয়ে এমনকি শরীরও কিনতে চায় না বজলু। এজন্য কিছু না হলেও না।

পৃথিবীতে আসলে কেউ কারো না।
২১.
সে রাতে কামালের বাসা থেকে সীমা এবং প্রদীপ চলে যাওয়ার পর বজলুর নিজেকে কেমন শূন্য মনে হলো। সীমা মেয়েটার জন্য সত্যি ওর একধরনের মায়া জন্মেছে। যেমন রানীর প্রতি আছে বিরক্তি। রানী ছিল সত্যিকারের লোভী প্রকৃতির মেয়ে। কিন্তু সীমা তা না। সীমা কখনও কিছু চায় নি। এমনকি বজলু কখনও ওকে একটা গিফটও দেয়নি। সীমাই নিতে চাইতো না। ও শুধু বন্ধুত্বই চেয়েছিল। বজলু আসলে সীমার মনই বোঝেনি। ও শুধু সীমার শরীরের প্রতিই আকৃষ্ট হয়েছিল। এখন বুঝতে পারছে সীমা কতখানি ওর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। বজলুর উপেক্ষাই সীমাকে ওর কাছ থেকে দুরে সরিয়ে দিয়েছে। বজলুর মনে হলো সীমাকে ও কোনোদিন ভুলতে পারবে না। সীমার সততা আর সরলতা কখনও ভুলে যাওয়ার নয়। এভাবেই বজলু সবকিছু হারায়। সীমা ব্যানার্জীর সাথে আর যদি কখনো দেখা হয় তাহলে মাপ চেয়ে নেবে। বজলু একটা ব্যাপারে নিশ্চিত যে সীমা আর কখনও ওকে কাছে টানবে না। প্রদীপ খুব ভালো ছেলে। ওদের জীবন সুন্দর হোক। শুধু একবার করজোরে ক্ষমা প্রার্থনা করবে বজলু। ও যনো বজলুর উপর কোনো ক্ষোভ না রাখে। সেই সুযোগ কী বজলু পাবে?
কতজনের সাথেইতো জীবনে চলার পথে পরিচয় হয়। কথায় আছে 'পরিচিত হই কোটিক কিন্তু বন্ধু হই গুটিক'। কথাটা সত্যি বটে। কেউই শেষ পর্যন্ত থাকে না। চলচ্চিত্রের দৃশ্যের মতো এক একটা দৃশ্য আসে আবার চলে যায়। থাকে কিছু স্মৃতির ডালি। স্মৃতি ছাড়া মানুষের আর কিইবা আছে। সব স্মৃতি সুখের হয় না এই যা।
সেই যে বাংলাদেশে লঞ্চে দেখা হয়েছিল স্বর্ণার সাথে! কী অদ্ভুত মেয়ে ছিল স্বর্ণা। সেই রাতে কী ব্যাকুল ছিল বজলুর কাছে আসার জন্য! পরে অদ্ভুতভাবে হারিয়ে গেলো। মিলাই কিছু কম করেছিল ওকে নিয়ে! সেই মিলাও কত বদলে গেছে। কক্সবাজারে দেখা হয়েছিল সুরাইয়ার সাথে। কী মিষ্টি মেয়ে। শুধু ঘার নারতো। ওই ভঙ্গিটাই বজলুকে পাগল করে দিয়েছিল। সেই রাতে খিলগাঁওয়ের বাসার ছাদে একবার শুধু সুরাইয়ার হাত ধরতে চেয়েছিল কিন্তু সুরাইয়া রাজী হয় নি। রূপাতো রীতমতো অপমানই করলো। রূপা আর রানী প্রায় একই চরিত্রের। নিউইয়র্কের রোমান্টিক লেখিকা কনাও ঝড়ের মতো এসেছিল। একমাত্র শিলাই বজলুতে বুঝতে পেরেছে। শিলা একদম অন্যরকম। শিলার সাথে আর কারো মেলে না। শিলার কথা মনে পরতেই মনটা কেমন আদ্র হয়ে উঠলো। অনেক দিন শিলার সাথে যোগাযোগ হয় না। বজলু এটা নিশ্চিতভাবে বুঝেছে যে এই দুর প্রবাসে ওর ভাগ্যে আর যাই হোক শিলার মতো মেয়ে জুটবে না। শিলা যদি রাজী থাকে তাহলে শিলাকেই বিয়ে করবে বজলু। শিলা কী রাজী হবে?
আরও একজনে কথা খুব মনে পড়ছে, সেও বজলুর সাথে খুব অদ্ভুৎ আচরন করেছিল। বজলুকে অনেক দিয়েছিল। তার নাম ছিল নিরোলা। নিরোলার সাথে দেখা হয় একটা কমিউনিটির পিকনিকে। ভার্জিনিয়ার মনেরাম পরিবেশে পিকনিকি হচ্ছিল। ছেলে মেয়েরা খেলছিল। নিরোলাও মেতে উঠেছিল বাচ্চাদের সাথে খেলায়। বজলু গিয়েছিল নিউইয়র্ক থেকে। নিরোলাও। সাব্বির পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল নিরোলার সাথে। নিরোলা বজলুকে খুবই আকৃষ্ট করলো। নিরোলার কাছ

থেকে ওর ফোন নম্বর চেয়ে নিয়েছিল বজলু। নিরোলার প্রথমই যে জিনিসটি আকৃষ্ট করেছিল বজলুকে তা হচ্ছে নিরোলার চোখ আর তার বক্ষদ্বয়। খুবই আকর্ষনীয় তার বক্ষযুগল। একটু উদ্ধত বলা যায়। সুন্দর বক্ষ বজলুকে এক ধরণের স্বর্গীয় অনুভূতি দেয়। নিরোলার বয়স চব্বিশ পঁচিশ হবে।

নিউউয়র্ক ফিরে কয়েকদিন গ্যাপে নিরোলাকে ফোন দিল। মনখুলে কথা হলো। বেশ কয়েকদিন ফোনে কথা বলে একধরনের সহজ সম্পর্ক হয়ে গেলো। নিরোলা থাকে কুইন্সে। উডসাইডে ওর বাসা। কাছাকাছি একটা চার্চের কাছে যেতে বললো একদিন।

দূর থেকেই নিরোলাকে দেখতে পেলো বজলু। চার্চ থেকে বের হওয়ার কারণেই বুঝতে পারলো নিরোলা খৃষ্টান। ধর্ম নিয়ে বজলুর অবশ্য কোনো মাথাব্যথা নেই। আজ বরিবার। সময়টা বিকেল। রবিবার সবাই চার্চে যায়। সবাই খুব সুন্দর করে সাজু গুজু করেছে। পনেরোদিন আগে প্রথম দেখেছিল নিরোলাকে ভার্জিনিয়ায়। আজকে আরো সুন্দর লাগছে। যে পোষাকটি পড়েছে তাতে ওর উদ্ধত বক্ষ আরো প্রস্ফুটিত। খোলামেলা। এইতো চাই। কারো সৌন্দর্য্য থাকলে সে তা দেখাবে না কোনো! এক ধরণের আমন্ত্রণ আছে ওর চোখে। নিরোলার হাসিটা খুবই সুন্দর। অমায়িক। দেখা হতেই হাসলো নিরোলা।

কেমন আছো!

বজলু হেসে বলল, যাক আবার দেখা হলো।

কেনো তুমি ভেবেছিলে দেখা হবে না!

মেয়েদের মন বোঝা মুস্কিল। ক্ষনে ক্ষনে বদলায়।

তুমি ফোন নম্বর চেয়ে না নিলে আর হয়ত দেখাই হতো না কোনোদিন।

তোমাকে দেখে এমন ভালো লাগলো সেদিন!

আমার মনে হয় কি জানো!

কি!

তুমি একটু চাপাবাজ আছো। তোমাকে ঠিক বুঝতে পারছি না।

ধুর কী যে বলো! যা সত্যি তাই বলছি। কোথায় যাবে বলো।

যেখানে ইচ্ছে!

তাহলে আমার বাসায় চলো!

নো ওয়ে। কোনো বাসায় টাসায় না।

তাহলে কোনো মোটেলে! নিরালায়!!

খাবে এক থাপ্পর।

তাহলে কোথায় বলো!

গাড়িতে ঘুরে বেড়াই। নিউইয়র্ক দেখি।

আচ্ছা কোনো বললে আমি চাপাবাজ!

তোমার সাহস দেখে আমি অবাক হচ্ছি।

কেনো!

প্রথম দিনই কেউ ফোনে এভাবে কথা বলে আমি জানতাম না ।
সবকিছু দ্রুত জেনে নেওয়াই সভ্যতা ।
আচ্ছা তুমি যা বলো সব মনের কথা!
অবশ্যই ।
সবাইকেই তুমি এভাবে বলো!
আরে না । তুমি স্পেশাল তাই তোমাকে বলেছি ।
চুপ করো ।
বিদ্যা!
শাটআপ!
গাড়ি ড্রাইভ করতে করতে হঠাৎ বজলু নিরোলার হাত ধরলো ।
নিরোলা কপট রাগ দেখিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিল ।
কি হলো!
বেশী সাহস ।
এতে সাহসের কি আছে ।
আমাকে ধরবা না!
তাহলে কাকে ধরবো! আবার হাত ধরলো নিরোলার । নিরোলা কিছু বলছে না দেখে শক্ত করে ধরে থাকলো । বলল,তোমাকে আজকে খুব হট লাগছে ।
এটা কী ধরণের ভাষা!
ওহ্ সরি ।
তুমি এর আগেও এই জাতীয় কথা বলেছো ।
তুমি মাইন্ড করেছো!
প্রথম প্রথম করতাম । পরে মনে হয়েছে তুমি এরকমই । পাজী টাইপ ।
শোনো আমি কোনো কিছু চেপে রাখতে পারি না । যা মনে হয় তাই বলি । তুমি সত্যি স্পেশাল ।
এটা সত্যি তোমার মনের কথা!
জ্বী ম্যাডাম ।
ওরা একটা সুন্দর দেখে পর্কে ঢুকে পরলো । নিরোলাই পার্কটার সন্ধান দিলো । আসার সময় কিছু খাবার কিনে নিল । একটা নিরিবিলি জায়গায় দু'জন বসলো । সামনেই একটা কৃত্তিম লেকের মতো । চিকণ ধারায় পানি বয়ে চলছে পির পির শব্দ করে । চারিদিকে ঝড়া পাতারা উড়ে উড়ে যাচ্ছে । সূর্যটা ডুবে গেছে কিছুক্ষন আগে । প্রলম্বিত বিকেল গাছের ফাঁকে ঝুলে আছে । একটা চক চকা পাটির উপর চিত হয়ে শুয়ে গল্প করছে বজলু । পাশেই বসা নিরোলা । হঠাৎ বজলু নিরোলাকে ওর বুকের উপর শুয়ে দিল । প্রথমে বজলু ওর পা নিরোলার পায়ের উপর তুলে দিয়েছিল । তাতে নিরোলা রাগ দেখালো । নিরোলা উঠতে চেষ্টা করেও পারলো না ।
তুমি কী বলোতো!
কী ।

এ রকম কোনো করো! এ রকম করোনা প্লীজ!
তোমার খারাপ লাগছে!
হ্যাঁ।
আমার এতো ভালো লাগছে কেনো নিরোলা!
এ রকম করলে আমি আর আসবো না তোমার কাছে।
যাও আর করবো না।
এতো তাড়া কিসের তোমার!
২২.
নিরোলা বজলুর ব্যাপারে একটু কনফিউজ। ওর সাথে এভাবে কেউ কখনো কথা বলেনি। নিরোলা অনেক পাটি পার্টি করে। নাচে, ড্রিঙ্ক করে। অনেকের সাথেই মেলামেশা করে। কিন্তু বজলু মানুষটা একটু যেনো কেমন। ঠিক এভায়েড করা যায় না। কয়েকবার ভেবেছে আর ফোন ধরবে না, কথা বলবে না। কিন্তু পারেনি। যতই কথা হয়েছে ততই কেমন এক নেশার ঘোরে আকৃষ্ট হচ্ছে। কথা বার্তায় একটু পলিশ এবং ডেসপারেট বজলু। আবার নিজেকে গুটিয়েও নিতে পারে। একধরণের সূক্ষ্ম তাচ্ছিল্যেরভাবও আছে। আবার তীব্রভাবে আর্কষ্টও করে। কথার যাদু কী! ঠিক বোঝা যায় না।
নিরোলার বিয়ে হয়েছে বিশ বছর বয়সে। তিন বছরের একটা মেয়ে আছে। হুট করে বিয়ে এবং সন্তান। ব্যাপারটা নিরোলা ভালোভাবে নিতে পারেনি। প্রথমদিন ওর হাজবন্ডকেও দেখেছিল পিকনিকে। যেহেতু নিরোলা ওকে ফোন নম্বর দিয়েছে সুতরাং ফোন করতে বজলুর আটকায়নি। নিরোলাই একদিন কলেছিল ওদের সম্পর্কটা তত মধুর না। ওর হাজবেন্ড ওকে যতটা ভালোবাসে নিরোলা ততটা পারে না। এর কারণ হচ্ছে নিরোলার ধারনা ওর হাজবেন্ড স্মার্ট না। মানুষের সাথে মিশতে পারে না। গুম মেরে বসে থাকে। দার্শনিক টাইপ। কোথাও তেমন নিয়েও যেতে চায় না। আর নিরোলা হচ্ছে এর বিপরীত। সে ছেলে বন্ধু পছন্দ করে। হৈ চৈ, পার্টি এসব তার প্রিয়। ওর হাজবেন্ড ওকে খুবই সন্দেহের চোখে দেখে। তবে সে এর আগে কখনও কোনো ছেলের সাথে এভাবে জড়িয়ে পড়েনি। কারো সাথে শারীরিক সম্পর্কও নেই। একমাত্র বজলুই ওকে বিশষভাবে আর্কষ্ট করে তুলছে। বজলুর মধ্যে শেষ দেখার একটা প্রবনতা আছে।
এর কয়েকদিন পর নিরোলা ফোন করলো। একটার দিকে। বজলু ইচ্ছে করেই ফোন করেনি। বজলু ব্যস্তও ছিল ওর মোবাইল ব্যবসা নিয়ে। বাবু কয়েকদিন ছিল না বলে ওকে একাই দোকান সামলাতে হচ্ছে। আজকে দোকান বন্ধ। বাবু ভালো রাঁধেও। এখন এ কাজটি বজলুকেই করতে হচ্ছে। বজলুর মধ্যে এক ধরনের নির্লিপ্ততা আছে। একধরনের সূক্ষ্ম উপেক্ষা। বা এটা হতে পারে অন্যের আগ্রহটা পর্যবেক্ষন করা। একটা আর্কষণ তৈরী করে দিয়ে দূরে সরে থাকা। বজলু ঘরে বসে কী একটা খাবার তৈরী করছিল।
নিরোলা ফোনে রেগে বললো এ কয়দিন ফোন করোনি কোনো!
দেখলাম তুমি করো কিনা। থ্যাঙ্কস ফোন করার জন্য।
আমি খুব রাগ করেছি।

রাগলেতো তোমাকে হেভি সেক্সি লাগে!
না দেখেই ফাজলামো হচ্ছে।
চলে এসো তাহলেই দেখতে পাবো।
কী করছো বাসায়!
কি আর করবো। সবচেয়ে অপছন্দের কাজটি করছি। কুকিং।
করতে হবেনা।
তাহলে না খেয়ে থাকবো!
তোমার না খেয়ে থাকাই ভালো। তোমার বাসায় কিভাবে আসবো বলো!
তুমি আসবে! সত্যি!
তোমার জন্য খাবার নিয়ে আসবো। সব আমার নিজের হাতের রান্না।
কী কী রেঁধেছো।
যা যা তুমি পছন্দ করো। ভয় নেই কোনো হারাম খাবার নেই।
আমার পছন্দ তুমি কিভাবে জানো।
তুমি বলেছো। এখন ভুলে গেছো। তুমি একটা শয়তান।
বজলু হো হো করে হেসে উঠলো।
হাসবা না ইবলিশের মতো।
আমার সবচেয়ে প্রিয় খাবার কি জানো!
কী!
পরে বলবো।

বজলু নিরোলাকে ডিরেকশন বলে দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে থাকলো। এ যে মেঘ না চাইতেই জল। নিরোলা এতো তাড়াতাড়ি নিজেই ওর বাসায় আসতে চাইবে ভাবে নি। চটপট বাসা গুছিয়ে নিল বজলু। এয়ার ফ্রেশনার স্প্রে করলো। যদি নিরোলা ড্রিঙ্ক করে! চেক করে দেখলো কি কি ড্রিঙ্ক আছে। প্রচুর খাবার আছে আপ্যায়নের জন্য।
নিরোলা বিশাল এক ব্যাগ নিয়ে বজলুর সুসজ্জিত এপার্টমেন্টে হাজির। নিরোলা বজলুর উল্টোদিকের সোফায় বসলো পায়ের উপর পা তুলে। নিরোলা কালো রঙের স্কার্ট পড়ে এসেছে। পায়ের উপর পা তুলে বসায় ওর চমৎকার পায়ের ডিম প্রস্ফুটিত হয়েছে। কার্ল করা চুলে ওকে অন্যরকম লাগছে। শার্টের উপরের একটা বোতাম খোলা। ওর সুউন্নত বক্ষ চমৎকারভাবে ফুটে আছে, যেনো দুটি পদ্ম। চোখে কাজল এঁকেছে। আজকাল এটা ফ্যাশন। কী পারফিউম মেখে এসেছে কে জানে। কেমন মাদকতায় ভরা। কাছে টানে।
তোমার শরীর থেকে একটা মন পাগল করা ঘ্রাণ পাচ্ছি নিরোলা।
তাই!
হু।
কী যাদু আছে বলোতো। একটু কাছে এসে দেখবো নাকি!

ফাজলামো হচ্ছে না!
একটু আসি কাছে!
কাছেইতো আছি।
না আরো কাছে।
বেশী কাছে আসা কি ভালো!
কোনো নয়!
একটা ইদুর বেড়াল খেলার মেতা হচ্ছে। বজলু জানে যে কিছু একটা ঘটবে আজ। তারপরও যাচাই করে নিচ্ছে। নিরোলার কথার মধ্যেও একটা আমন্ত্রণ আছে। প্রচ্ছন্ন। আবার কত সময়তো কিছুই ঘটে না। মেয়েদের মনের গতিবিধি বোঝা খুব কঠিন। বজলু নিজেকে আবার সেই পুরনো প্রশ্নটা করলো। ওর মধ্যে কি কোনো ভালবাসা কাজ করছে? উত্তর হচ্ছে না। কারণ বজলুতো কিছু ফিল করছে না! শুধু একধরণের উত্তেজনা মনের ভিতর। ওর শরীর একটু একটু কাঁপছে। সেটা ভালোবাসার জন্য নয়, নিরোলাকে বুকের মধ্যে পাওয়ার জন্য। নিজেকে শূন্য মনে হচ্ছে। একটা হাহাকার। জ্বালা। নিরোলাকে পেলেই ভরে উঠবে এই শূন্য বুক। বজলু প্রতিটা সম্পর্কের ক্ষেত্রে কামনা কওে একটা ভালেবাসাটা জন্মাক। কিন্তু শেষপর্যন্ত ওরকম কিছু হয়নাতো!
বজলু নিরোলার পাশে এসে বসলো। নিরোলার হাত তুলে নিয়ে একটু আদর করলো। ঠোঁটে ছোঁয়ালো আঙুল। ওর হাত নিজের বুকের উপর চেপে ধরে বললো, দেখেছো কেমন ড্রাম পেটোনোর মতো শব্দ হচ্ছে! তোমার ওরকম হয়না!
কি জানি!
দেখি।
বলেই বজলু নিরোলার বুকে কান পাতলো।
কিছু টের পাচ্ছো!
নাতো!
তোমার মুন্ড! মুতি একটা শয়তান।
ভালোমতো চেক করতে হবে।
বজলু নিরোলার বুকে নিজের মাথা চেপে রাখলো। ওর শার্টের ওপরের খোলা বুকে মুখ ঘষতে লাগলো। নিরোলা বজলুর মাথা ওর বুকের সাথে চেপে ধরলো। বজলু নিরোলার মসৃন গলায় চুমু খেলো। ওর চিবুকে, গালে, নাকে, কপালে চুমু খেতে থাকলো। ওর চুল থেকেও পাগল পাগল ঘ্রাণ পাচ্ছে। এরপর বজলু নিরোলার দুঠোটে ওর ঠোট ডুবিয়ে দিল। গভীর আশেষে চুম্বন করলো। যেনো এর শেষ নেই। অনন্তকাল ধরে চলবে এই চুম্বন। নিরোলার শার্টের বোতাম খুলে ফেললো বজলু। ওর স্তনের বিশাল গভীরতায় মুখ ডুবিয়ে দিল। নিরোলা উন্মত্তের মতো করছে। সোফায় লুটিয়ে পড়লো নিরোলা। বজলু নিরোলার বুকের সাথে বুক মিশিয়ে ওকে চুম্বন করে চলেছে। বজলু যখন নিরোলার মসৃন পেটে, নাভিতে আদর করতে থাকলো তখন নিরোলা হঠাৎ এলোমেলো অবস্থা থেকে উঠে বসলো। বজলু পাগলের মতো আদর করেই যাচ্ছে। নিরোলা বজলুকে একটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল।

কি হলো!
শোনো।
কি হয়েছে। কাঁপা গলায় বজলু বললো।
তোমার সাথে আমার জরুরী কথা আছে।
কি কথা!
তুমি কী চাও বলোতো!
তোমাকে!
কেনো!
তোমাকে আমার ভালো লাগে।
তারপর!
তারপর জানি না!
এরপর কি হবে!
তোমাকে আমি ভালোবাসি নিরোলা!
এটা তোমার মনে কথা!
ততক্ষনে নিরোলা নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছে। যে আবেগে ফুটছিল নিরোলা তা প্রশমিত হয়ে গেছে। ঠোঁটের কোনে এক চিলতে হাসি নিয়ে নিরোলা বললো, চলো এবার খাবার খাবে। নিরোলা ঠোঁটে লিপস্টিক মেখে নিল। এর মানে কি নিরোলা আর চুমু খেতে দেবে না! চট করে ভেবে নিল বজলু। বজলু এখনও আশা ছাড়েনি। আর কিছু কি ঘটবে না আজ! ঘটতেই যে হবে। নিরোলাকে যে পুরোপুরি চায় বজলু! ওকে বঞ্চিত করে চলে যাবে নিরোলা! বজলু তাহলে আর নিরোলার সাথে সম্পর্কই রাখবে না। নিরোলা এতটা নিষ্ঠুর হবে! বজলুর তা মনে হয় না।
বজলু নিজেকে যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা করছে। বজলু এমন কোনো আচরণ করবে না যা দেখতে বিসদৃশ্য লাগে। নিরোলা ওকে ছোটলোক ভাবুক। বজলু কি আসলে ভালো মানুষ! নাকি ভালোমানুষির মুখোশ পড়ে আছে! এখনও সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়নি। নিরোলা হয়ত সময় নিচ্ছে। মেয়েরা এতো সহজে কাউকে নিজেকে উজার করে দেয় না। তারা ভালোবাসাটা চায়। না হোক ভালোবাসার একটা প্রতিশ্রুতি।
২৩.
শোনো, তোমার চোখে আমি কোনো ভালাবাসা দেখতে পাইনি।
নিরোলা আমরা দু'জনতো ভালো বন্ধু!
বন্ধু বলেইতো তোমার বাসায় এসেছি।
বন্ধুর জন্য সবটুকু করা যায়।
তোমাকে আমি বুঝে গেছি।
বজলু একটু ঘাবরে বললো কি বুঝেছো!
কিছু না।
সত্যি আমি তোমাকে ভালোবাসি।

ওকে।
নিরোলা উঠে টেবিলে খাবার সাজাতে লাগলো। ও নিজের হাতে বজলুর জন্য অনেক খাবার করে নিয়ে এসেছে। সব দেশী খবার। ভাত, সব্জী, মাছ, মাংস। এমনকি ডাল পর্যন্ত। নিরোলা খাবার ওভেনে দিয়ে গরম করলো। পেটে বাড়লো। নিজের হাতে মাখলো। তারপর বজলুকে খাইয়ে দিতে লাগলো। মা যেমন বাচ্চাকে খাইয়ে দ্যায় তেমনি।
বজলু নিরোলার এই কান্ড দেখে অভিভূত হয়ে গেলো। মুগ্ধ হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলো।
কি হলো!
বজলুর চোখটা কি একটু আর্দ্র হয়ে উঠলো! বললো কিছু না।
শোনো তোমার যখনই কিছু খেতে ইচ্ছে করবে আমাকে বলবে, ঠিক আছে!
বজলু কৃতজ্ঞতাসূচক মাথা নেড়ে বলল, তুমি খুব ভালো।
হয়েছে। খাও।
তুমি খাবে না।
আমি পরে খাবো।
খাওয়া শেষ হলে নিরোলা চমৎকার চা বানালো। এক কাপ নিজে নিল আর এক কাপ বজলুকে দিল।
ভালো ড্রিঙ্ক ছিল নিরোলা। তুমিতো ড্রিঙ্ক পছন্দ করো।
আজকে ড্রিঙ্ক না। অন্যদিন। যেদিন আমরা পার্টি করবো। অনেক নাচ করবো সেদিন। সবকিছুর জন্য একটা প্রস্তুতি আছে। হুট করে সব হয় না। সব সময় সব পেতে চাওয়াও উচিত না। সবকিছুর একটা লগ্ন আছে।
তুমি রাগ করেছো!
না।
তুমি খুব ভালো নিরোলা।
আরো একবার বলেছো। শেনো আমি ভালো না।
একথা কেনো বলছো।
ভালো হলে তোমার ঘরে আসতাম না।
এটা কোনো কথা না। কারো ব্যক্তিসত্বা থাকবে না! নিজের ভালো লাগা মন্দ লাগা থাকবে না! মানুষের মধ্যে সততার বড় অভাব। আচ্ছা তুমি কি নিজেকে সৎ মনে করো!
তাতো করি।
কিন্তু তুমি সৎ না।
সেই অর্থে কেউই আমরা সৎ না। তুমিও না।
জানি। আমিতো বললামই আমি ভালো না। তাছাড়া আমি ভালো করেই জানি তুমি কি চাও। ছেলেদের চোখ দেখলে মেয়েরা বুঝতে পারে। তোমাকে আমি বুঝতে পারার পরও তোমাকে অস্বীকার করতে পারিনি। এটাই আমার ব্যর্থতা। আমার দুর্বলতা।

নিরোলা উঠে ওয়াশ রুমে গেলো। বজলু সোফায় বসে নিরোলার কথাগুলো ভাবতে লাগলো। বজলুর মধ্যে কোনো আদর্শ কাজ করছে না। নিরোলা ওকে অসৎ বলায় একধরণের আত্মগানি হচ্ছে। নিরোলার প্রতি এতক্ষনের আবেগটা তিরোহিত হয়ে গেছে হঠাৎ।
নিরোলা ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে এলো। নিরোলা সম্পূর্ন নগ্ন। বিজলু বিস্ময়ে এতোটাই বিমূঢ় হয়ে গেলো যে নিরোলার সৌন্দর্য মোটেই দেখতে পাচ্ছে না! এক ধরণের জ্বালা অনুভব করছে। নিরোলা একেবারে বজলুর কাছে চলো এলো। ওর বক্ষ বজলুর মুখের সাথে লেগে যাচ্ছে। নিরোলা নিস্পৃহ কন্ঠে বললো, নাও আমাকে। তুমিতো এই চেয়েছিলে!
চারিদিকে একটা নিঃসীম নিস্তব্দতা। পেনের মধ্যে সব যাত্রীই প্রায় ঘুমিয়ে। শুধু ঘুম নেই বজলুর চোখে। দু'একজন রীডিংলাইট জ্বালিয়ে বই পড়ছে। ব্রিটিশ এয়ার ওয়েজের লন্ডন-নিউইয়র্ক ফ্লাইট। পেনটি আটলান্টিক পাড়ি দিচ্ছে ৩৫ হজার ফিট আলটিচুট দিয়ে। অন্ধকার জানালা দিয়ে অসীমের দিকে তাকিয়ে আছে বজলু। সেখানে ঘন অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়েনা। এক টুকরো পেনের সীটে বসে বজলু নিজের ক্ষুদে অস্তিত্বের কথা ভাবছে। কী দাম এই জীবনের! জীবন কত তুচ্ছ! প্রকৃতির বিশালতার কাছে এই জীবন কিছুই না। একজন নিশ্চয়ই কেউ আছেন যিনি সব জানেন। তার ইচ্ছার উপর সব কিছু। তিনি যদি না চান তাহলে এই পেন আর কখনও ল্যান্ড করবে না!
আজকের এই রাতে অতীতের দিনগুলোর কথা ভেবে নিজের অজান্তেই বজলুর দু'চোখ পানিতে ভরে উঠলো। শেষ পর্যন্তই বজলু নিঃস্ব হয়ে ফিরে এসেছে। জীবনের কাছে এক বিরাট ব্যর্থতা ওকে সারা জীবন তাড়া করে বেড়াবে। তাহলে এই জীবন রেখে কী লাভ! বজলু নিজেকে অপরাধী ভাবছে। অনেক ভুলের পাহাড় জমেছে। তার একটা প্রায়শ্চিত্ত নিশ্চয়ই আছে!
কতজনই তো কত অপরাধ করে! নৈতিক অপরাধ করেও সাধু বনে থাকে। বজলু ওর অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। বজলু অনেককেই দেখেছে বাইরে সাধু সেজে থাকে, আন্যের ছোট খাটো ভুল দেখলে তেড়ে আসে। কিন্তু সে যে নিজেই একজন পাপী তা সহজে স্বীকার করে না। ছদ্মবেশী শয়তানের অভাব নেই এই পৃথিবীতে। মানুষ কখনও নিজেকে ফাঁকি দিতে পারে না। অন্যের ভুলত্রুটি নিয়ে গলা ফটাতে পারে কিন্তু নিজের ভুল সহজে চোখে পড়ে না।
২৪.
বজলু মাত্র দু'সপ্তাহের জন্য বাংলাদশে গিয়েছিল। মা যেতে বলেছিল। বজলু এমনিতেই যেতে চেয়েছিল। শিলার সাথে দেখা করবে। অনেকতো হলো। আর না। বজলু নিজের মনের সাথে অনেক যুদ্ধ করেছে। নিরোলা ওভাবে অপমান করে চলে যাওয়ার পর বুঝেছে এটা জীবন নয়। জীবনের মর্মার্থ এটা নয়। জীবন আরো সুন্দর, আরো অর্থময়। জীবনে বেঁচে থাকার একটা অর্থ আছে। অনিশ্চিত ভালোবাসা কিছুই দেয় না শেষপর্যন্ত। শুধু শূন্যতা ঘিরে থাকে। বজলু একটা মরীচিকার পিছনে ছুটেছে এতোদিন। সেখানে কিছু জৈবিক তাড়না ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বজলু সেই ঘিন ঘিনে অভিজ্ঞতায় আর ফিরতে চায় না। নিজের কাছে অনুশোচনায় ভুগতে চায় না। সবাইকেই একটা সময় জীবনের গতিপথ ঠিক করে নিতে হয়। বজলু সংসার করতে চায়।

বজলু নিশ্চিত যে শিলা ওকে ফেরাবে না। শিলাতো অন্য আর দশজন মেয়ের মতো না। শিলা ব্যতিক্রম। শিলার প্রতি ওর অন্যরকম একটা মমতা আছে। যদিও শিলা একদিন বলেছিল তুমি শুধু রূপে ভোলো। প্রয়োজেন শিলাকে সব খুলে বলবে। নিজের ভুলের জন্য ক্ষমা চাইবে। শিলা ওকে নিশ্চয়ই বুঝবে। শিলার মধ্যে ক্ষমা করার একটা অসাধারন গুন আছে।
নিরোলা সেদিন বলতে গেলে বজলুকে অপমান করেই ওর বাসা থেকে চলে গিয়েছিল। বলে গিয়েছিল আর যেনো কোনোদিন ওর সাথে যোগাযোগের চেষ্টা না করে। আসলে সেদিন নিরোলার চোখে বজলু প্রচন্ড ঘৃণাই দেখেছিল।
শিলা মাস্টার্স কমপ্লিট করে ঘরে বসে আছে। ওর জন্য পাত্র দেখা হচ্ছে। শিলার নিজের পছন্দ বলে কিছু নেই। সে মা-বাবা যেখানে বিয়ে দেবে সেখানেই বিয়ে করবে। একজন প্রবাসী পাত্রকে তারা একসময় পছন্দ করেছিল। কিন্তু শিলা সেই ছেলেকে বিয়ে করতে চায়নি কারণ তাকে সে দেখেনি কখনও।
বজলু আগে থেকে কাউকে কিছু জানায়নি। একদিন শিলাদের বাসায় গিয়ে চমকে দিল বজলু। বজলুকে দেখে শিলা খুব খুশী হলো। হৈ চৈ করলো ওকে নিয়ে। বজলু যা যা খেতে পছন্দ করে সেসব রেধে খাওয়ালো। বজলুর মন থেকে সব কালিমা আস্তে আস্তে মুছে যেতে থাকলো। শিলা মেয়েটা কী ভীষন সরল। কী ভীষন ভালো শিলা। কোনো জটিলতা নেই। বজললু যে কতদিন ধরে কোনো যোগাযোগই করেনি সে নিয়ে কোনো অভিযোগ করলো না। সবকিছু সহজভাবে নেয়ার একটা অসাধারন ক্ষমতা আছে শিলার।
শিলাকে নিয়ে একদিন বিকেলে বজলু ঘুরতে বের হলো। মফস্বল শহরের নিস্তরঙ্গ বিকেল চমৎকার লাগছে। ওরা দু'জন নদীর ধারে গিয়ে বসলো। মৃদু মন্দ বাতাসে শিলার চুল উড়ছে। দুরে কয়েকটা পাখী উড়ে যাচ্ছে। নৌকা পারাপার করছে মাঝি। শিলার সরল মুখাবয়বে কী একটা মায়া। বজলুর মনটা হঠাৎ হু হু করে উঠলো। কেনো তা জানে না।
তোর দিন কেমন কাটছে শিলা।
ভালোইতো।
কী প্যান এখন!
জানিনা। রেজাল্ট বের হোক। চাকরি করার ইচ্ছা আছে।
চেষ্টা করছিস!
এখনও না।
তোর সেই বিদেশী পাত্রের খবর কী!
ধুর কবে সেটা চুকে বুকে গেছে!
শিলা।
বলো ভাইয়া।
তোকে একটা কথা বলতে চাই। কিভাবে বলবো বুঝতে পারছি না।
বলো।
রাখবি তো!

আগে বলোই না।
আমি তোকে বিয়ে করতে চাই শিলা। আমি অনেক ভেবে বলছি।
শিলা কিছুক্ষন চুপ করে থাকলো। বজলু রুদ্ধ নিঃস্বাসে অপেক্ষা করছে শিলার উত্তর শোনার জন্য।
চুপ করে আছিস কোনো! বল কিছু!
পরে বলবো।
না। এখনই বল।
আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে ভাইয়া। তুমি দেরী করে ফেলেছো।
২৫.
এরপর বাড়িতে যে ক'দিন ছিল বজলু মায়ের পাশেই বসে থেকেছে। বয়স হয়ে গেলে মানুষের কথা বলার ঝোঁক বেড়ে যায়। বজলুর মায়েরও তাই। মায়ের পাশে বসে কথা শোনার আনন্দই আলাদা। বজলু দেখেছে আজকাল কথা বলতে গিয়ে মা প্রায়ই তাল হারিয়ে ফেলেন। একটার সাথে আর একটার কোন মিল নেই। আবোল-তাবোল, অর্থহীন পুরোনো দিনের কথা বলতে বলতে ভুল হয়ে যায়, এক কথা থেকে পারম্পর্যহীন আর এক কথা এসে পড়ে, কখনো ভবিষ্যৎ চাকরি, বিয়ে কিংবা রোগা হয়ে যাওয়া চেহারার কথা বলতে বলতে সম্পূর্ণ অবাস্তব জগতে চলে যায় মা। বলে, একটা বাড়ি করবি বাপের ভিটায়, আমি দেখে যেতে চাই তুই কিছু করেছিস, কখনোই তো বৈষয়িক হলি না। পুরো তেরো কাঠা জমির ঘেরওয়ালা বাড়ি, ছটা আম, চারটে কাঁঠাল, একটা আমড়া, সজনে, দশটা সুপুরি, আর দশটা নারকেল গাছ লাগাবি। গোয়াল ঘরের চালের উপর লকলকিয়ে উঠবে লাউডগা। সংসারী হতে হবে।
কোন সুদুর ছেলে বেলায় দেখা পুরনো ছবিটাকে মা আবার টেনে এনে দূর ভবিষ্যতের গায়ে টাঙিয়ে রাখেন। এভাবেই একটা মানুষ ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় মৃত্যুর দিকে। দীর্ঘ সব ঘুমহীন রাত জেগে ভাবতে ভাবতে মা'র মনে সব অতীত গুলিয়ে ওঠে। কথা বলতে বলতে আস্তে আস্তে হাল্কা হয়ে যায় মায়ের মন, আর তখন এইসব একা একা দীর্ঘ দিনরাত্রিগুলোকে আর একটু সহনীয় মনে হয় মা'র। বজলুকে মা কখনোই ভালমতো কাছে পায়নি। মায়ের কোলকে বজলু কখনোই ভরিয়ে তুলতে পারিনি। বাড়িতে যে ক'দিন মায়ের কাছে থাকে, মা কেবল গল্প করে। নদী, নৌকা আর গাছগাছালির গল্প। মায়ের হতে যাদু ছিল। মাটি কথা বলতো মায়ের সাথে। যা কিছু মায়ের হাতে রোপন করা হতো তাই লকলকিয়ে উঠতো। মাছ, ধান আর পিঠে পায়েসের গল্প। একঘেঁয়ে, তবু কান পেতে শোনে বজলু। ছোটবেলার মামা বাড়ির গল্প। তখন নদী, নৌকো, মাছ আর ধান অস্তিত্বের সাথে মিশে গিয়েছিল। এখন সেইসব গল্প করে মা, মায়ের গলায় জল-মাটির নোনা আর সোঁদা গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে যায়। তবু সব কিছু ছাপিয়ে ওঠে সেই পিপড়ার কামড়, শেষ রাত্রির আবছায়ায় ঘুম ও স্তব্ধতার মধ্যে এক অলৌকিক নিরুদ্দেশ যাত্রা।
বজলুর ফিরে যাওয়ার সময় হয়। সেদিনের আকাশেও সপ্তর্ষি ছিল, ছায়াপথ ছিল না। মা বসে থাকেন পাশে। পিঠে হাত বোলান। কথা বলেন না। এভাবেই নীরবে মাতা-পুত্রের সময় পার হয়। ধুলারাশির মতো আকীর্ণ নক্ষত্রপুঞ্জ বিপুল একটি অনির্দিষ্ট পথের মতো পড়ে থাকে, ওখানে রোজ ঝড় ওঠে, ঝড়ো হাওয়ায় নক্ষত্রের গুঁড়ো উড়ে সমস্ত আকাশে ছড়ায়। সপ্তর্ষির চেহারা শান্ত। প্রশ্ন

চিহ্নের মতো। ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগতের সীমায় বসে আছেন সাতজন শান্ত-সমাহিত ঋষি। মৃত্যুও পর থাকে কি কোন চেতনা? অথবা আর একবার কি জন্ম নেয়া যায়? মৃত্যু, মহান একটি ঘুম, তার বেশি কিছু না। ছেলেবেলায় মেলার শেষে ফাঁকা মাঠে শুয়ে থেকে আকাশ দেখা হতো। দেখতে দেখতে কোন্ শূন্যতায় পৌঁছে যেতো মন। পার্থিব কোনকিছুই আর মনে থাকতো না। তখন আকাশে থাকতেন দেবতারা, মানুষের ইচ্ছা পূরণ করতেন। আজ তাঁরা কেউ নেই, না মনে, না আকশে। তবু আজও সপ্তর্ষির অদৃশ্য আলো শরীর আর মনে অনুভব করা যায়।

আবার যদি দেখা হতো মায়ের সাথে। আবার যদি!

বলতো আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দাওতো মা, একটু হাত রাখো।

মা মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, কেন রে?

সব ভুলিয়ে দাও তো মা, ভুলিয়ে দাও তো। বুদ্ধি, স্মৃতি, অবস্থা ভুলিয়ে দাও। আবার ছোট হয়ে কোলে ফিরে যাই।

শিলা ওকে ফিরিয়ে দেয়ার পর বজলুর আর কিছুই কথা বলার ছিল না। বজলুর প্রত্যাশার উল্টোটা ঘটায় বজলু পুরোপুরি নিঃস্ব হয়ে ফিরে এসেছে। (সমাপ্ত)

টরন্টো